Available online at http://www.ijims.com
ISSN: 2348 – 0343

Globalization in Bengali Drama and Ajitesh Bandopadhyay

বাংলা নাটকে বিশ্বায়ন ও নাট্যকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

Abhijit Gangopadhyay
Dept . of Bengali
Nahata J.N.M.S. Mahavidyalaya, North 24 Parganas, W.B., India

Abstract

Ajitesh Bandyopadhyay is one of the most successful playwright in Modern Bengali Drama. In Sixties, Ajitesh has come from an industrial area far away from Calcutta and initiated the transition of his stage life beside two of the most powerful playwrights of that era in Bengali theatre like Shambhu Mitra (1915-1997) and Utpal Dutta (1929-1993). If we look on his direction, acting, play and other theatrical part of his performance, it can be easily seen that the main string of his dramatic success was hidden in making the localised form of Bengali drama from the source of various famous Western drama of Bertolt Brecht, Henrik Ibsen, Pirandello and many others. Mainly, by the process of his *Bangiyakarana*or *Sthanikarana* (ie. 'Localisation') he made the direct translation from foreign play in to the Bengali form. In his action of work, he took the background of the original foreign play out of the ground according to its country, men and time and set it in to his own dramatic creation as per the contemporary Bengali society with a new story, characters and dialogues. The socio-economic structure of the contemporary Bengali culture with its regional base was tried to shown in every respect on stage by him and his co-actors in a natural way. In foreign playwrights Shakespeare, Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Bertolt Brecht, Jean Paul Sartre, Albert Camus, Henrik Ibsen, Edward Albee and many others have already been converted in to Bengali drama in many ways. To dissolve the traditional 'empathy' of Brecht's drama in to modern Bengali play was being practiced by Ajitesh more practically rather than its theoretical application. He has made the ideal production of Brecht's play in Bengali drama. He was one of the wonderful successor among those Bengali playwrights who has tried to reach in goal with global attitude by their particular dramatic effort and work. Playwrights like Ashok Mukherjee, Ramaprasad Banik, Rudrapasada Sengupta, Soumitra Chatterjee and Bivash Chakraborty has taken a vivid choice regarding the style of acting as well as the selection of subject for localisation like Ajitesh Bandopadhyay.
Key Words: Ajitesh Bandopadhyay, Localisation, Foreign Play, Bengali Theatre, Regional Base, Global Attitude.

Article

'একটা গল্প বলি শুনুন, একটা গল্প বলি
দিনের গোড়ায় রাতটা যেমন তেমনি গল্পের গোড়া
এক দেশে এক রাজার ছিল আট আটটা ঘোড়া।

সাতটা ঘোড়া প্রাণ পণ লড়ত ছিল কাজের কাজী
আট নম্বর ঘোড়াটা ছিল কুঁড়ে এবং পাজী
তবু রাজা বলতো তাকে 'তুমি সেরা ঘোড়া
যুদ্ধের কাজ দেখতে শুনতে নেইকো তোমার জোড়া'।

কবিতাটির নাম 'আট ঘোড়ার গান' অথবা 'একটা গল্প বলি শোনো'। বেরটোল্ট ব্রেখটের মূল রচনার অনুবাদ। যিনি এর অনুবাদ এবং সাঙ্গীতিক সুরারোপ করেছিলেন তিনি আর কেউ নন, অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বে বাংলা নাটক তথা থিয়েটারকে যিনি বিশ্ব থিয়েটারের সাথে জুড়ে দিতে পেরেছিলেন সেই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩০.০৯.১৯৩৩-০১.১০.১৯৮৩)। নাট্যকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের রূপকার ছাড়াও অনুবাদক, সুরকার, গীতিকার, নাট্য সমালোচক ছিলেন তিনি। ফিচার রচয়িতা, নাটক-যাত্রা-সিনেমা সহ অভিনয়, প্রযোজনা ও

নির্দেশনার মতো বহুমুখী শৈল্পিক প্রবণতা ও প্রতিভায় ভাস্বর এই নাট্যকার যথার্থ অর্থেই ছিলেন 'শের আফগান'। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আত্মপ্রত্যয়ী, দৃঢ়নিষ্ঠ। নাটকের বিষয়বস্তু সহ ভাবগত আঙ্গিকেও যিনি অবিরত এনেছেন নানাবিধ বৈচিত্র্য। মাইকেলের মতোই একান্ত অনুরাগী বিদেশী সাহিত্য পাঠে। তাঁর অভিনীত অনুবাদ নাটকগুলি দেখে যে কোন প্রখ্যাত বিদেশী নাট্য দর্শনের মতোই একাধারে ভয়, দুঃখ ও ক্রোধের বিমিশ্র প্রকাশে দর্শকরা কখনও হয়েছেন চমকিত কখনও বা বিস্মিত।

Stella Adler একসময় বলেছিলেন "The word theatre comes from the Greeks. It means the seeing place. It is the place people come to see the truth about life and the social situation. The theatre is a spiritual and social X-ray of its time. The theatre was created to tell people the truth about life and the social situation." গ্রীক নাটকের মধ্য দিয়েই বিশ্ব নাট্য সাহিত্যের সূচনা। কালের অমোঘ নিয়মে নাটকের রূপ-রীতি-আঙ্গিক ক্রমে বদলেছে। ১৮৮০ সালে ইউরোপে এক নতুন নাট্যান্দোলন শুরু হয়েছিল বাস্তবধর্মী নাটককে কেন্দ্র করে। কমার্শিয়াল থিয়েটার কর্তৃক বর্জিত বাস্তবধর্মী নাটক খুঁজে পেয়েছিল কিছু সংখ্যক অপেশাদার নাট্যকর্মী, যারা নিজেদের আদর্শকে তুলে ধরেছিল আর্থিক লাভ-লোকসানের ঊর্ধে। ১৮৮৭ সালে প্যারিসে, আর্দ্রে আঁতোয়া একটি থিয়েটার দল প্রতিষ্ঠা করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন এবং তারপরে কোলকাতায় নবান্ন নাটকটিকে কেন্দ্র করে যে নবনাট্য আন্দোলন ঘটেছিল, সেটাও ছিল যেন ইউরোপের নবনাট্যেরই পুনরাবৃত্তি। সত্তর ও আশির দশকে এসে বাংলা মঞ্চনাটক প্রোসেনিয়ামের ঘেরাটোপ ভেঙে শহীদ মিনার, পার্ক, ময়দান, রাজপথেও ঠাঁই করে নিল। বিদেশী নাটকের রূপান্তরিত মঞ্চায়নেরও হলো শুরু। বিদেশী নাট্যকারদের মধ্যে স্যামুয়েল বেকেট, ইউজিন আয়ানেস্কা, ব্রেটল্ট ব্রেখট, জ্যঁ পল সার্ত, এলবেয়ার ক্যামু, এডওয়ার্ড এলবি, মলিয়ের, মোলনার, শেক্সপীয়র, হেনরিক ইবসেন প্রমুখের নাটক অনূদীত ও রূপান্তরিত হয়েছে। এরমধ্যে শেক্সপীয়র, মলিয়ের, ব্রেখট ও ইবসেনের নাটকের মঞ্চায়নই বেশি হয়েছে। ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের কমেডিসমূহ প্রবলভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে দিনে দিনে। মলিয়েরের মতোই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন জার্মান নাট্যকার ব্রেটল্ট ব্রেখট। বাঙালি নাট্যকারদের মনে স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গডো'র মতো নিরীক্ষামূলক নাটক যেমন ঠাঁই পেয়েছে তেমনি সফোক্লিসের রাজা ঈডিপাসের মতো ধ্রুপদী নাটকের মঞ্চায়নও ঘটিয়েছেন তাঁরা।

কথায় আছে Theatre is life. Cinema is art. Television is furniture. TheatreTheatre এক শিল্প। জীবন্ত এই শিল্প মাধ্যম মানুষের সাথে মানুষের বন্ধন সৃষ্টি করে দেয় সরাসরি। একটা কথা তো চালুই আছে, মানুষের সাথে মানুষের মহামিলন ঘটে থিয়েটারেই। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিটি থিয়েটার কর্মী কাজ করেন, সে কাজের অংশীদার হয় প্রতিটি দর্শকও। এ যেন গণতন্ত্রের এক সহজপাঠ। মত বিনিময়, আলোচনার এমন সূবর্ণ পাটাতন আর কোথায়ই বা আছে! হয়তো সে কারণেই সমাজ গঠনেও থিয়েটার সরাসরি ভূমিকা রাখে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ', মীর মোশারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ', মাইকেল মধূসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' শুধু বাংলা থিয়েটারের সম্পদ নয়, বাঙালি ও বাংলার সমাজ বদলের এক ধারাবাহিক পাঠ হিসাবেও বিবেচ্য। সমাজ গঠনে এই সব নাটক গুলি চিরকালই অগ্রজের ভূমিকা পালন করে এসেছে। সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র যাই বলি না কেন, সে তো মানুষকে নিয়েই সৃষ্টি। তাই থিয়েটারের কেন্দ্রবিন্দুও মানুষ। থিয়েটার ব্যক্তি মানুষের বিকাশেও সব্বোর্চ্চ ভূমিকা রাখে। ব্যক্তি মানুষের সৃষ্টিশীলতা, আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলাবোধ বাড়াতে আর কোন শিল্প মাধ্যম এতোটা অগ্রগণ্য নয়। একটা সময় সারা পৃথিবী ব্যাপী বিভিন্ন দেশ-কালের পটভূমিতে নাট্যচর্চা ও মঞ্চায়নে ভিন্নতা থাকলেও বস্তুত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের ভিন্নতা কখনই ছিল না। আধুনিক তৃতীয় বিশ্বে ব্যক্তির বিকাশ ও সমষ্টির বহুমাত্রিক উন্নয়নে নাট্যচর্চা প্রায় অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবেই গৃহিত হয়েছে। গ্রীক নাটকে মানুষের আত্মিক বিকাশ ও সমাজ সংস্কার; শেক্সপীয়রের নাটকে জীবনবীক্ষণের পুনর্মূল্যায়ন ও পরিবর্তন এবং উত্তরকালের নাটকে তাঁকে আরো বেশী জীবন অন্বিষ্ট করে তুলে ধরতে নাট্যকাররা বারে বারেই সচেষ্ট হয়েছেন। নাটককে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করে ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও সমষ্টির উন্নয়নে যে রাষ্ট্র বা জাতি তাকে সর্বোত্তম রূপে ব্যবহার করতে পেরেছে সভ্যতার ইতিহাসে তারাই শিখরস্পর্শী হয়েছে। পৃথিবীর এমন

কোন একটি সভ্যতার কথা বলা যাবে না; এমন কোন একটি বিপ্লবের নাম উচ্চারণ করা যাবে না যেখানে নাটক তাকে সামনে থেকে পথ দেখায়নি। কারণ নাটক তো শুধু একটি প্রকাশ ভঙ্গিই নয়। নাটক মানুষকে ভাবায়, সচেতন করে, সমাজ সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলে। তাই তো ইবসেনের নোরা যখন শেষ দৃশ্যে দরজা বন্ধ করে নারী স্বাধীনতার অঙ্গিকার নিয়ে বেরিয়ে আসে তখন ইউরোপের হাজার হাজার ঘরে তার প্রভাব পড়ে, নারীরা আর পুতুলের সংসারে আটকে থাকায় বিশ্বাসী নয়। নারী সচেতনতায় ইবসেনের 'ডলস হাউস' সারা বিশ্বকে সচেতন করে তোলে। ব্রেখটের প্রতিটি নাটক মানুষকে শেখায়, সচেতন করে। শ্রেণী সংগ্রাম আর অর্থনৈতিক মুক্তি নিয়ে হাজার প্রবন্ধ লিখে যা করা সম্ভব নয় ব্রেখটের 'লোক সমান লোক' কিংবা 'বিধি ও ব্যতিক্রম' তা করে দেখিয়ে দেয়। এরিস্টফানিসের 'লিসিট্রাট্রা' কিংবা ব্রেখটেরই 'মাদার কারেজ' মানুষকে যুদ্ধ বিরোধী করে তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা মানব সভ্যতার মুখে যে কালি মেখে দেয় তার অর্থহীনতা নিয়ে হাসাহাসি করেন বেকেট, আয়ানেস্কো, এদামভ এর মতো নাট্যকাররা। 'বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গডো' আমাদের শিখিয়ে দেয় জীবনের প্রতিটি পদে, প্রতিটি পলে আমরা শুধু অপেক্ষাই করে যাচ্ছি। উদ্দেশ্যহীন সেই অপেক্ষা কখনো হাস্যকর, ক্লান্তিকর, বিরক্তিকর পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। তবু এস্ট্রাগনের মতো আমরা 'চলো যাই' বলেও কোথাও যাই না, ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকি। থিয়েটার জীবন্ত, তাই স্বভাবগতভাবে আমাদের মনোযোগের পুরোটাই কেড়ে নেয় থিয়েটার। প্রায় সব জাতির ইতিহাসেই একটা সময় মানবিকতার পক্ষে, বিপ্লবে-বিদ্রোহে, বোমারু বোমার থেকেও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে এসেছে নাটক। সোভিয়েত বিপ্লবের ইতিহাস আমাদের অজানা নেই। ব্রিটিশ নীল শোষণের বিরুদ্ধে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' এক ভয়ংকর শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। মীর মশাররফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণ' তো একসময় ছিল কোটি কোটি শ্রেণিশোষিত মানুষের মুক্তির বাইবেল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়ও রাস্তা-ঘাট, ট্রাকের পাটাতনকে মঞ্চ হিসাবে বানিয়ে বিক্ষুব্ধ শিল্পীসমাজ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বাংলা নাটককে ব্যবহার করেছে তার মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে। ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের যেখানেই মানুষ তার অস্তিত্বের বিপন্নতার শিকার হয়েছে, যেখানেই শ্রেণিবৈষম্যের কলুষ নষ্ট করেছে মানুষের যাবতীয় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য, সেখানেই নাটকের এই বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটেছে।

হেনরিক ইবসেন সম্পর্কে জর্জ বার্নাড শ' লিখেছিলেন, "তিনটি বিপ্লব, ছয়টি ক্রুসেড, দুইটি বিদেশী আক্রমণ এবং একটা ভূমিকম্পের যা ফল হতে পারে ইংল্যান্ডের উপর ইবসেনের প্রভাব তার সমকক্ষ।" বলাবাহুল্য যে ইবসেন ইংল্যান্ডের নাট্যকার নন। বাস্তববাদী ধারার প্রবর্তক নরওয়েজীয় নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের আবির্ভাব বিশ্ব নাটকের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তবু ইউরোপের নাট্য জগতে আজ ইবসেন যুগ প্রবর্তক এবং বিশ্ব নাটকের ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক। বস্তুতই সর্বগ্রাসী ভোগবাদ, পুঁজিবাদ, গণতন্ত্রের মুখোশে সাম্রাজ্যবাদের দানবীয় আগ্রাসন; বিশ্বায়নের পেটিয়ায় আজ ঢুকে পড়ছে নানা ছোট ছোট রাষ্ট্র ও জাতি। সাপের পাঁচ পা দেখার মতো বিজ্ঞানের পাঁচ পা দেখেও উল্লসিত বিশ্ববাসী গোটা বিশ শতক জুড়েই টের পেয়েছে বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক কী রূপ! বিশ শতকের প্রান্তিক সময়ের উৎকট ব্যাধি, বিকারগ্রস্ত মানবতা ও মানব অস্তিত্ব একুশশতকের প্রথম দশকে আরো মহামারির রূপ নিয়েছে। শিক্ষা-শিল্প-সংস্কৃতি কিছুই রেহাই পায়নি এই মহামারি থেকে যা বিরুদ্ধ স্রোতের বিপরীতে দাঁড়াতে পারেনি। বিজ্ঞানের ঈশ্বরীয় শক্তি এতটাই বেড়েছে; এমন অস্ত্রের আবিষ্কার করেছে মানুষ; পৃথিবী নামক গ্রহটিকে নিশ্চিহ্ন করতে যার মাত্র কয়েক ঘণ্টাই যথেষ্ট। এরই বাস্তব ফলাফল দুটো বিশ্বযুদ্ধের অসম্ভব ও অকল্পনীয় রক্তপাত ও অসংখ্য মানুষের বিনাশ, বিনাশ অসংখ্য মানুষের বহুকালের 'বিশ্বাস'-এর। একটি অসহ্য, অসহনীয়, উৎকট বাস্তবতা ও নিষ্ঠুর নৃশংসতা মানুষের রক্তের কণায় কণায় অনুকণায় অনুপ্রবেশ করে সব কিছুকেই ক্রমশঃ শেষ করে ফেলছে। শিল্প-সংস্কৃতির প্রাচীনতম শাখা নাটকও সময়ের এই অনিরুদ্ধ টানের শিকার। বিশের দশকে এসে তাই বহুচর্চিত গ্রীক নাটক বা শেক্সপীয়রীয় নাটকের নাট্য কলা কৌশলের ক্ষেত্রেও ঘটেছে আমূল পরিবর্তন। মানুষের সভ্যতার প্রায় সমবয়সী যে শিল্পমাধ্যমটি

এতকাল সভ্যতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্মাণে সক্রিয় ও শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে কাজ করে এসেছে; প্রাচীন মিশরীয় থিয়েটার, গ্রীক থিয়েটার, ভারতীয় সংস্কৃতি নির্ভর থিয়েটারের গৌরবচিহ্ন যার সারা শরীরে; সেই থিয়েটারকেই বাস্তবতার কঠিন সত্যকে মেনে মানুষের কাছাকাছি আসতেই হয়েছে মানুষেরই স্বার্থে। শুরু হয়েছে বিখ্যাত নাটকের স্থানীকরণ বা নাট্যরূপান্তরকরণের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত সময়, মানুষ ও তার সমাজকে নতুনভাবে চিহ্নায়ণের কাজ। এ যেন নাটকের ভিতর থেকেই আর এক নাটকের পুনর্জন্ম, যার নবাঙ্কুরিত নাট্যকায়ায় জুড়ে আছে এক নতুন জীবনাদর্শ অথবা জীবনদর্শন যা সমকালাক্রান্ত হয়েও শুধুমাত্রই সমকালের নয়, সাহিত্যের চিরাচরিত ধারা মেনেই তা চিরায়ত। আধুনিক কালের বিখ্যাত নাট্যকাররা অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাই এর পথ প্রস্তুত করে গেছেন ভাবীকালের কাছে। এরউইন পিসকটের 'থিয়েটার ট্রাইবুনাল', রম্যাঁ রলার 'পিপলস থিয়েটার' বেরটোল্ড ব্রেখটের 'পলিটিক্যাল থিয়েটার' ও 'এপিক থিয়েটার', রসকিডের 'পপুলার থিয়েটার' ইত্যাদি থিয়েটারগুলি তারই প্রমাণ। কালের বিবর্তনে আর যোগ্যতমের উদ্বর্তনে পরবর্তীতে উঠে এসেছেন যে সকল সফল নাট্যকাররা, তাঁদের মধ্যে যাঁরাই প্রথা বিরোধী অথবা প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার পথে পা বাড়িয়েছেন অথবা আক্ষরিক অর্থেই গণমুখী হয়ে উঠতে পেরেছেন তাঁদেরই যাদুকাঠির ছোঁয়ায় বিখ্যাত নাটকের রূপান্তরিত ফর্মগুলি নতুন আঙ্গিকে ক্রমশঃই পলিটিক্যাল, এপিক অথবা পপুলার থিয়েটার নির্মানের পথেই হেঁটেছে। একসময় শেক্সপীরীয়ান ট্রাজেডী নাটকের অনুভবের সাথে পা মিলিয়ে হাঁটতে চেয়েছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষের মতো নাট্যকারেরা। কিন্তু যখন শেক্সপীরীয়ান ট্রাজেডীর পুরনো পথেই এলেন আন্তন চেকভ অথবা বেরটোল্ট ব্রেখটের মতো আধুনিক নাট্যকারেরা তখনই নাটকের রূপান্তরকরণের রূপরীতিটাও গেল বদলে। স্বয়ং চেকভের ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটেছিল। জাঁর আমলে যখন প্রায় সকলেই নাটকের ক্ষেত্রে শেক্সপীয়রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তখন আন্তন চেকভকে আমরা দেখেছি ভীষণভাবে অ্যান্টি শেক্সপীরিয়ান, অ্যান্টি-ট্র্যাডিশনাল ও অ্যান্টি স্ট্রাকচারিস্ট। সারা বিশ্বে যুদ্ধবিরোধী গণচেতনা, যুদ্ধাপরাধীর বিচার, যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে নারীর অধিকার,মানবিকতাবিরোধী আগ্রাসনের বিরুদ্ধতা তথা সার্বিক মানবিক সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব গড়ার ডাক প্রভৃতি বিষয় বিশ শতকীয় ভারতবর্ষের নাট্যরূপান্তরনেরও শুভ সূচনা করেছে। ১৮৮২ সালে 'অ্যান এনিমি অব দ্য পিপল' নাটকে ইবসেন গণ মানুষের দায় ও ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করেন। ড. স্টকমান চরিত্রের মাধ্যমে মাধ্যমে তিনি সৃষ্টি করেন এক নতুন সমাজ সংস্কারক চরিত্র যা প্রতিবাদী চেতনার। আর্থার মিলারের মতো নাট্যকার এই গল্প নিয়ে পরবর্তীতে নাটক লেখেন আরো অনেকে আর বাংলার সত্যজিৎ রায় এই নাটক নিয়েই হাল আমলে তৈরি করেন তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'গণশত্রু'। এ থেকেই বোঝা যায় শতাধিক বৎসর পার হলেও ইবসেনের নাটকের প্রাসঙ্গিকতা আজও এতটুকু কমেনি। বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রায় সকল বাঙ্গালী নাট্যকারদের কাছেই বিদেশী নাটকের বঙ্গীয়করণের কাজগুলিও ছিল দেশ-কাল অনুযায়ী একেবারেই তাঁদের নিজস্ব ধ্যান ধারণা প্রসূত। সেদিক থেকে বলা যায়, বঙ্গীয়করণের এই ধারা বাংলা নাটককে বিশ্বায়নের মঞ্চে এগিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছে।

ইউরোপীয় অভিঘাতে উদ্ভুত আমাদের পরিচিত প্রোসেনিয়াম থিয়েটারের নাট্যপ্রয়োগ রীতি রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেনি। নাট্য উপস্থাপনা, দৃশ্য ও মঞ্চবিন্যাস এবং প্রকাশ ভঙ্গির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এক ভিন্নতর রীতিকে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। প্রখ্যাত পাঞ্জাবী নাট্যকার বলবন্ত গার্গী বলেছেন 'রবীন্দ্রনাথের নাটক আদ্যপ্রান্ত ভারতীয় নাট্যশৈলীর অনুসারী'। 'ভারতীয় নাট্যশৈলী' কথাটার মধ্যেই একটা ধাঁধাঁ আছে। কারণ আমাদের নাট্যধারার উদ্ভব ও বিকাশ সনাতন ভারতীয় নাট্যশৈলী বা সংস্কৃত নাট্যশৈলীর অনুসারী ছিল না। প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যধারার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে ইউরোপীয় নাট্যধারা আসার অনেক আগেই। সুতরাং ভারতীয় নাট্যশৈলী বলতে আমরা বুঝবো নাটকের পরম্পরাগত শৈলী এবং নাট্য প্রয়োগের নানান পরীক্ষা নীরিক্ষা ও নব নব প্রয়োগের দ্বারা পরিবর্তিত নাট্যশৈলী এই দুই দিগন্তের মিলনকে। উপনিবেশবাদ, দ্রুত নগরায়ন ও নূতন শ্রেণী বিন্যাস বাংলার নিজস্ব নাট্যধারার বিকাশ হতে দেয়নি, যদিও আমাদের নানান লোককথা, কৃষ্ণ যাত্রা, পাঁচালি গান ও মঙ্গল কাব্যে এমনকি কীর্তন গানেও বাংলা নাটকের উপাদান ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্য উপস্থাপন রীতি লোক আঙ্গিক থেকে গ্রহণ করেছিলেন। প্রোসেনিয়াম

থিয়েটারের 'রিয়ালিস্টিক' মঞ্চ ব্যবহারের রীতি তাঁর পছন্দ ছিল না, বরং দৃশ্যপটহীন যাত্রা তাঁকে বেশী আকর্ষণ করত কারণ, তাতে দর্শকমন্ডলীর সঙ্গে নাট্যকথার নৈকট্য থাকে। 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় একথা তিনি জানিয়েওছিলেন। কিন্তু আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বহুরূপীর প্রযোজনাগুলি বাদ দিলে গত শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে কলকাতা বা মফঃস্বলে বাংলার গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের যে প্রবাহ, সেখানেও রবীন্দ্রনাট্যের আন্তরিক প্রযোজনা খুব সামান্যই। শম্ভু মিত্র ছাড়া সমকালীন বাংলা নাট্যজগতের আর দুই দিকপাল উৎপল দত্ত ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র নাটক করেন নি। উৎপল দত্ত তাঁর লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে 'অচলায়তন', 'তপতী' নাটক করেছিলেন, কিন্তু 'অংগার', 'কল্লোল', 'ব্যারিকেড', 'টিনের তলোয়ার'-এর উৎপল দত্ত পরের দিকে আর কোনো সার্থক রবীন্দ্র নাটকে অভিনয় করেননি। অবশ্য স্বাধীনোত্তরকালে বাংলা নাটকের বিশাল ব্যাপ্তি ও প্রসারে আমাদের মঞ্চনাটকের ভূমিকাই ছিল প্রধান। লোকনাট্যের চেহারায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের যাত্রাপালার ভূমিকাও সেই অর্থে সুস্থ নাটকের বিপ্লব ঘটাতে পারেনি। কিন্তু এ প্রসঙ্গ উপস্থাপনের উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চায়নের সমালোচনা অথবা গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে নয়, আসল বিষয় যা হলো তা উৎপল দত্ত ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নাট্য ব্যক্তিত্বরা আধুনিক বাংলা নাটককে যেমন আধুনিক গণনাট্য আন্দোলনের বিশেষ সূচীমুখ তৈরীর তির্যকতা দিতে চেয়েছিলেন তেমনি সেই প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কখনো কখনো বিখ্যাত বিদেশী নাটকের হাতও ধরেছিলেন। ফলে বিদেশী নাটকের বঙ্গীয়করণ অথবা স্থানীকরণের কাজটি এই দশকগুলি থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা, কম্যুনিজমের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আগ্রহ এবং সর্বোপরি থিয়েটারের প্রতি তাঁর নিবিড় ভালোবাসা এ পথকে আরও বেশী সার্থকতা প্রদান করেছিল।

বাংলা নাটক যখন তার অপভ্রংশের জঠর থেরে সবেমাত্র মুক্তিলাভ করেছে ঠিক তখনই রঙ্গমঞ্চের মাটিকে নতুনভাবে স্পর্শ করলেন অজিতেশ। জন্ম নিল 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'-এর মতো প্রথম মঞ্চসফল নাটক যা IPTA কর্তৃক মঞ্চায়িত হয়। জনপ্রিয়তা পায় 'সেতুবন্ধন', 'সওদাগরের নৌকো'র মতো নাটক। পাশাপাশি বাংলা নাটকে আন্তর্জাতিক মান আনতে অনুবাদ করলেন 'শের আফগান', 'তিন পয়সার পালা', 'পাপপুণ্য-', 'ভালোমানুষ','চেখভের ৭টি নাটক' ইত্যাদি। কয়েকজনকে নিয়ে দল বানালেন। নাম রাখলেন 'নান্দীকার'। সাল ১৯৬০। দেশে তখন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তির পাল্টা হাওয়া। অর্থনীতি ও সমাজনীতিতে একটা জায়গা খুঁজে নেওয়ার প্রয়াসে ব্যস্ত ভারতবর্ষ। তখনই কবিতা ও উপন্যাসের পাশাপাশি নাটক নিয়েও মাথা ঘামালেন অজিতেশ। সমাজ ও সময়কে সঙ্গে নিয়েই অধিকার বুঝে নেওয়ার দাবি থেকে লিখলেন'হে সময় উত্তাল সময়', 'জলছবি'। নাটক সম্পাদনার কাজে মন দিয়েছেন তার কিছু আগেই। সম্পাদনা করলেন সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত নাটক 'একটি রাজনৈতিক হত্যা'। থেমে নেই অনুবাদ ও রূপান্তরের কাজও। ততদিনে কলকাতার অভিনয় জগতে অজিতেশ একটি সমীহ জাগানো নাম। পেশাদারি মঞ্চে তাঁর নাটক নির্দেশনা ও অভিনয় এক অন্য ভাবনার জন্ম দিচ্ছে। 'আন্তিগোনে, 'থানা থেকে আসছি, 'বাঘিনী', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' প্রভৃতি নাটক মঞ্চাভিনয়ের সাথে সাথেই অনুরোধ আসতে থাকল রূপোলি পর্দার। শত অনুরোধেও প্রথমে রাজি না হলেও দল চালানোর খরচ তুলতেই চলচ্চিত্রে অভিনয়ে শেষমেশ রাজি হন অজিতেশ। 'হাটেবাজারে' ছবিতে বৈজয়ন্তীমালার উদ্দেশে তাঁর বিখ্যাত ভরাট গলার সেই ডাক 'ছিবলি' শুনে চমকে ওঠেননি এমন সিনেমাপ্রেমী পাওয়া দুষ্কর। এছাড়াও অভিনয় করেছেন অতিথি, ছুটি, হংসমিথুন,প্রণয়পাশা, ঠগিনী, আলেয়ার আলো, কলকাতা ৭১, গণদেবতার মতো কমবেশি প্রায় ৫০টি ছবিতে। অভিনয় করেছেন তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়, দীনেন গুপ্ত, মৃণাল সেন, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় সহ আরো নানা নামকরা পরিচালকের পরিচালনায়। বলিউডেও পা রেখেছিলেন অজিতেশ। অনজানে মেহমান, এক আধুরি কহানি, সমঝওতা,১৯৭৭ ছবিতে রেখেছেন নিজের অভিনয়ের সাক্ষর। কিন্তু তারপরই কোনো এক অজানা অভিমানে নান্দীকার থেকে সরে এসে নয়া দল 'নান্দীমুখ'-এর জন্ম দিলেন অজিতেশ। জীবনের শেষপর্ব পর্যন্ত সেখানেই অভিনয় করে গিয়েছেন তিনি। সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির পুরস্কার, দিশারি পুরস্কার,

মস্কো নিউজ ক্লাব পুরস্কার, ক্রিটিক সার্কেল অব্ ইন্ডিয়া পুরস্কার ও 'ছবি বিশ্বাস' স্মৃতি পুরস্কার হাতে এসে গিয়েছে ততদিনে। কিন্তু নাটকের জন্য গোটা জীবনকে বাজি ধরতে পারেন যে প্রাণ তাঁকে পুরস্কারের মানদণ্ডে বিচার করা এক অবিচারই বটে। তাঁর নিজের লেখা নাটক 'ডেইলি প্যাসেঞ্জারের করুণ কাহিনী', 'খড়ির লিখন' (এ নাটকে গানও রচনা করেন তিনি) অন্যতম। আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হ্যানিবলের কিংবদন্তীকে অবলম্বন করে লেখা নাটক 'মনোডানা' একসময় জনপ্রিয়তা পায়। তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম 'নানা রঙের দিনগুলি', 'তামাকু সেবনের অপকারিতা' প্রভৃতি। এ সময় সমকালীন একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর রচিত উপন্যাস 'ভালো লেগেছিল'।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে মূলতঃ তিনটি জিনিস তাঁকে চিরকাল অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। ফুটবল, রাজনীতি এবং থিয়েটার। যদি তাঁর জীবনে আনন্দ আর অনুপ্রেরণার উৎস আর শুরুটা হয় ফুটবল তবে রাজনীতি হলো তার মাঝখানটা আর থিয়েটার হলো তার পরিণতি অথবা পরিপূর্ণতা। আসানসোলের বি.বি. কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করে কলকাতায় আসা ১৯৫৩ সালে। এরপর মণীন্দ্র কলেজে ভর্তি হওয়া ও ইংরাজীতে স্নাতক হয়ে শেষমেষ শিক্ষক পদে কাজ শুরু করা। পড়াশোনার ফাঁকে রাজনীতিতে আসা, গান্ধীজীর আদর্শ ছেড়ে কম্যুইনিজমের প্রতি ঝোঁক ও পরে কম্যুউনিস্ট পার্টির সদস্য রূপে যোগদান জীবনের প্রারম্ভিক ভিত্তি প্রস্তর রচনা করেছিল। এরই মাঝে পাথরডি রেলওয়ে ইন্সটিটিউটে 'টিপু সুলতান'-এ অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে নাটকেও জয়যাত্রার শুরু। কলকাতায় এসে গণনাট্য সংঘের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা অবশ্য আরো পরের ঘটনা। গণনাট্য সংঘের পাতিপুকুর শাখায় তখন তাঁর খুব নাম ডাক। এরই চারটি শাখাকে মিলিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা ও মঞ্চ সফল নাটক 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'। এরপর অবশ্য আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৬০ এর ২৯শে জুন তাঁরই সভাপতিত্বে এবং দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত ও অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ করে নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠী। প্রায় ১৭ বছর 'নান্দীকার'-এ থেকে থিয়েটারের নিগড়েই সম্পূর্ণ ও ওতপ্রোত ভাবে নিজেকে নিমজ্জিত করে দিয়েছিলেন নাট্যশিল্পী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৭ বছর পর কোনো এক অজ্ঞাত কারণে 'নান্দীকার' থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি, ১৯৭৭-এ গড়ে তোলেন নিজস্ব নাটকের দল 'নান্দীমুখ'। 'পাপ-পূণ্য'-এর মতো সফল নাটকের নাট্য প্রযোজনা ও অভিনয়ের পালা চলে সেখানেও, যার একটি মঞ্চসফল গানের ('একদিন আমি যাব বন্ধু') রচয়িতাও ছিলেন তিনি।

সুদূর শিল্পাঞ্চল থেকে কলকাতায় আসা ও তারপরে বাংলা থিয়েটারের দুই অন্যতম নাট্যকার শম্ভু মিত্র (১৯১৫-১৯৯৭) ও উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩)-এর সাথে নাম জুড়ে যাওয়া অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের পরিবর্তনকে সূচিত করেছিল। শম্ভু মিত্র বা উৎপল দত্ত দুজনেই দীর্ঘদিন কলকাতার থিয়েটার মহলে গণনাট্যের সমর্থনে একটা নাগরিক মঞ্চ অথবা নাগরিক সমাজ গড়ে তোলার প্রয়াস অনুভব করেছিলেন, শিল্পচর্চার প্রয়োগ ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশের সুযোগও সেখানে ছিল। তাঁরা যেমন তাঁদের জীবৎকালে রবীন্দ্রপন্থী আদর্শ অথবা রাজনৈতিক সচেতনতার গভীরে পৌঁছে বাংলা নাটক নিয়ে ভেবেছেন ও তার এক বিবর্তিত রূপ তুলে ধরারও চেষ্টা করেছেন, তাঁদেরই কাছাকাছি থেকে অন্য আঙ্গিকে অথচ ঠিক তেমনটাই চেষ্টা করে গেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বে বঙ্গ থিয়েটারকে বিশ্ব থিয়েটারের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি। বিষয়বৈচিত্রে ও ভাবনাগত তাৎপর্যে নতুনত্ব আনতে চেয়েছেন। বিদেশে বসে সে দেশের পটভূমিতে লেখা অজিতেশের বিভিন্ন বাংলা নাটকগুলি আঙ্গিক ও প্রকরণে বিদেশী হলেও ভাবে ও ধর্মে সেগুলি ছিল একান্তভাবেই এ বঙ্গের। বেরটোল্ট ব্রেখট সহ ইবসেন, চেখভ, পিরানদেল্লো, ওয়েস্কার, পিন্টার, আর্থার মিলার প্রমুখ বিশ্ব নাট্যসাহিত্যের নানান স্থপতিদের সাথে বাঙালীর পরিচয় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই। শুধু অনুবাদই নয়, বিদেশী নাট্যকারদের নাটকের বঙ্গীয়করণ করে তিনি তা মঞ্চে উপস্থাপন করতেন।

অধ্যাপক, নাট্য সমালোচক ও অভিনেতা ব্রাত্য বসুর মতেঃ "অজিতেশ পরিচালিত ও অভিনীত থিয়েটারগুলির দিকে যদি ন

জর করি, তবে দেখা যাবে, তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি প্রধানতঃ পাশ্চাত্য নাটকের স্থানীকরণ তথা বঙ্গীয়করণ। অ জিতেশ তাঁর কোনো কাজেই মূল নাটক থেকে সরাসরি অনুবাদ করেন নি,রূপান্তরও নয়। তিনি স্থানীকরণ বা 'লোকালাই জেশন' করেছেন। অর্থাৎ মূল নাটকটিকে তার পটভূমি থেকে তুলে এনে তাকে বাংলার মাটিতে ফেলে, দেশ-কাল-পরিস্থিতি অনুযায়ী গল্পটিকে, তার চরিত্র, সংলাপকে নির্মাণ করতেন। দর্শকের মনে হতো নাটকের বিষয় যেন এই বাংলার ই। কাজে তারা সহজেই আত্মস্থ হয়ে যেতেন নাটকের সঙ্গে।এটাই অজিতেশ ম্যাজিক।"

('তাঁর অবদান মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে', ব্রাত্য বসু, 'অতীতের তাঁরা', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৪) এ প্রসঙ্গে অজিতেশের নিজের মতটিও খুবই গ্রহণযোগ্য। তাঁর নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহের এক জায়গায় তিনি বলেনঃ "যে দেশে নাট্যশিল্প মাত্র একশো একাত্তর বছরের সে দেশ যে আরও পরিণত শিল্পক্ষেত্র থেকে গ্রহণের জন্য আগ্রহী হবে এটাই তো ভবিষ্যৎকে ভালো করবার পথ। 'বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে স্বদেশের কুকুর ভালো' এ নিতান্তই হাস্যকর, সংকীর্ণ ও গ্রামীণ দৃষ্টিভঙ্গী।" (অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৬, পৃঃ৫২) অজিতেশের এ যুক্তি যে বাংলা নাটকে 'লোকালাইজেশন'-এর সপক্ষে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

ষাট এবং সত্তরের দশকের বঙ্গ নাট্যচর্চায় এসেছে পালাবদল। বাংলা নাটকে বিশ্বায়নের এ এক সূবর্ণকাল। বিদেশী নাটকের রূপান্তরকরণের পাশাপাশি এসময় চলেছিল বাংলার প্রথাগত সামাজিক পরিকাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে ভিন্ন আর্থসামাজিক পরিবেশে নতুন নাট্যসংস্কৃতি নির্মাণের কাজ। এ সময়কার নাট্যচর্চা সম্পর্কে সমালোচক রাজদীপ কোনারের অনুভবঃ "A certain half of theatre practice has responded to the globalization process by openly accepting thematic and stylistic effects of foreign theatrical and cultural traditions while the second half has found its objective in searching and preserving traditional forms in their purity, making them their cultural bastion of identity and resistance." ষাটের দশকের বাংলায় যে অন্ধকার ও সর্বস্ব হারানোর যন্ত্রণা থেকে উঠে এসেছিল 'হাংরি আন্দোলন' তাই-ই ক্রমশঃ কবিতা-উপন্যাস-ছোটগল্প-নাটক সহ সাহিত্যের নানা শাখায় ছড়িয়ে পড়েছে। নাট্য সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যায় ষাট এবং সত্তরের দশকে মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও বাদল সরকারের মতো নাট্যকারেরা কিমিতিবাদী নাট্য রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। ইউনেস্কোর 'রাইনোসরাস' অবলম্বনে সোমেন চন্দ্র নন্দীর নাটক 'গণ্ডার' মঞ্চস্থ হয় নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে ১৯৬০ সালে। এ সময়ই পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিল 'থিয়েটারস্কোপ' ও কুরুচীপূর্ণ ক্যাবারে নৃত্য। কিন্তু সে সময় পেশাদারীত্বের দিকে কোনো নজর না দিয়ে ইউরোপীয় আধুনিকতার মানদণ্ডে থিয়েটারের ফর্ম নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গেছেন অজিতেশ। তবে অবিরত ফর্ম ভাঙার খেলা নয় বরং অজিতেশ আরো বেশী করে অভিনিবেশ করেছেন আঙ্গিকের নব নব রূপায়ণে। তাঁর এই ভিন্ন ভিন্ন নাট্য আঙ্গিকের চর্চা সৃষ্টি করেছে বিদেশী নাটকের আদলে দেশী নাটকের নানা রূপ যা সমকালের নাট্যরীতিকে তো বটেই এমনকি পরবর্তীকালের বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যরীতিকেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে।

তাঁর প্রথম রূপান্তরিত নাটক হেনরী ইবসেনের 'ঘোস্টস', যার স্থানীকরণও করেন দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৮১ সালে সালে লেখা 'ঘোস্টস' নাটকে ইবসেন অনেক বেশি নগ্ন, সাহসী, বিতর্কিত হয়ে উঠেছিলেন। ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষায় আর ম্যান্ডেলিয় বংশ গতির ধারায় ব্যাপক তাড়িত হন তিনি এ নাটকে। পিতার অবৈধ কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে সন্তান। সৎ ভাই-বোনের প্রেম আর পিতার গোপন যৌন রোগ ছড়িয়ে পড়িয়ে সন্তানের প্রতি, পাপের এই প্রেতাত্মা অনুসরণ করে পুরো নাটক জুড়েই। এই নাটক সম্পর্কে লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ লিখেছিলো, 'একটি খোলা নর্দমা; একটি দগদগে ব্যান্ডেজবিহীন ঘা, জনমানুষের সামনে তুলে ধরা একটি নোংরামি।' হেডা গাবলার (১৮৯০) যেন এক মনোবিকারগ্রস্থ নারীর কেস স্টাডি। ২৯ বছরের বিবাহিত হেডা অনাকাঙ্খিত এক সন্তানের জননী হতে যাচ্ছে, স্বামীকে নিয়ে সে অসুখী, পূববর্তী প্রেমিক মাতাল কবি লয়েভবার্গকে সে ধ্বংস করতে চায়, তার সব পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে দিতে চায়। এদিকে লয়েভবার্গ আত্মহত্যা করে। হেডার প্রতি আসক্ত জাজ ব্রাক সবকিছুই টের পায়, সে হেডাকে নিজের রক্ষিতা বানিয়ে রাখতে চায়। হেডাও আত্মহত্যা করে। এ নাটক সম্পর্কে একসময় অস্কার ওয়াইল্ড বলেছিলেন, 'আমি ভয় ও বেদনা অনুভব করি, এ যেন এক গ্রীক ট্রাজেডী।' অজিতেশের নাট্যায়িত রূপে 'ঘোস্টস' নাটকের মূল ভাবনাটিকে রক্ষা করা হয়েছে।

সত্তরের দশক থেকেই বাংলা নাটকে বেরটোল্ট ব্রেখটের নাটকের একটা বড় প্রভাব কাজ করেছে। উৎপল দত্ত ব্রেখট নিয়ে নানা লেখালেখি অথবা সত্যজিৎ রায়ের সভাপতিত্বে 'ব্রেখট সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করলেও নিজে কখনো ব্রেখটকে নিয়ে অথবা ব্রেখটের নাটক নিয়ে একটিও নাট্য প্রযোজনা করেননি। উৎপল দত্ত তাঁর নাট্যজীবনে ব্রেখটের একটি মাত্র নাটকের অনুবাদ করেছিলেন এবং তা হলো ব্রেখটের 'ডিমাস নামে' নাটক অবলম্বনে 'সমাধান'। সমালোচক রাজদীপ কোনার যথার্থই বলেনঃ 'It is indeed a fact that tilting the land of theatre with translations and adaptations of foreign plays did yield rich dividends in case of Bengali theatre. In form of crop, not only we have got excellent plays by Dutt, one after another; who, one should remember began his career by doing Shakespeare first at the Saint Xaviers college group and then with the group of famous English director Jeffrey Kendhal, Shakespiriana; but in the 60's and 70's we got brilliant plays by Badal Sircar like *Ebong Indrajit*, *Baki Itihas* and others and also by Mohit chattopadhay like *Mrityu Sanbad*, *Rajrokto*, *Konthonalite Surjo*, *Captain Hurrah*, *Mahakalir Baccha* and others. These plays have been of immense value to the development of Bengali theatre and it is a fact every theatre enthusiast would know that the inspiration behind writing of these plays were reading of foreign plays and also watching them being produced by the contemporary amateur theatre groups. However, Ajitesh in spite of being a supporter of translations and adaptations from foreign plays, was as have been often been wrongly alleged, not indifferent to the question of Indian regional forms of

theatre.' ষাট ও সত্তরের দশকে যাঁর প্রায় সমস্ত নাট্যভাবনা জুড়েই ছিলেন ব্রেখট তিনি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধুই ব্রেখটের নাটকের রূপান্তর ও তার প্রযোজনাই নয়, ব্রেখটীয় নাট্যের অভিনয়ভঙ্গীমাকেও আয়ত্ত করে সফলভাবে তার মঞ্চ প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন অজিতেশ। বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে অভিনয়ের সময়ও তাঁকে চেকভ অথবা ব্রেখটের নাটকের বই সাথে করে নিয়ে যেতে দেখা যেত। ব্রেখটীয় নাটকের আঙ্গিক ও অনুষঙ্গকে বাংলা মঞ্চের উপযোগী করে সমকালীন বাঙ্গালি সমাজ-মানসকে তুলে ধরেছিলেন তিনি। এদিক থেকে তাঁকে বাংলা নাটকের এক আদর্শ ব্রেখটীয় নাট্য প্রয়োগবিদ বলা যেতে পারে। মঞ্চায়নের ইতিহাসে বাঙ্গালি সমাজ-মানসের এই পুনর্নির্মান যে অভিনব ও অপ্রত্যাশিত ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ব্রেখট অবলম্বনে বংলা থিয়েটারে যে Basic Ground Work তিনি করে গেছেন তাকে অতিক্রম করার দুঃসাহস আর কোনো বাঙালি নাট্যকার করতে পেরেছেন কিনা জানা নেই তবে, তার মধ্যে দিয়ে সমকালীন ও ভাবীকালের নাট্যকারদের কাছে অজিতেশ যে এক Roll Model হয়ে উঠেছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁরই বিদেশী নাট্য রূপান্তরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন রমাপ্রসাদ বণিক, জ্ঞানেশ মুখার্জী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রণিধানযোগ্য নাট্যব্যক্তিত্বরা। রূপান্তরধর্মী নাট্যচর্চা, নাট্য প্রযোজনা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত 'থিয়েটার' গ্রন্থটির (পবিত্র সরকার ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত) নেপথ্য প্রেরণা ও উৎসাহদাতাও ছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রেখটীয় অভিনয়ের empathi কে ভেঙে দেওয়ার রীতিকে তাত্ত্বিকভাবে নয় বরং ফলিতভাবে চর্চা করেছেন তিনি। অর্থাৎ তাত্ত্বিকভাবে ব্রেখট পর্যালোচনা নয়, বরং হাতে-কলমে তার প্রদর্শন বা শিল্প মাধ্যমগত প্রয়োগেই বেশী পরিশ্রমী ছিলেন তিনি। তবে শুধু ব্রেখট নয়, চেকভের নাটকে যে কৌতুক, স্মৃতি মেদুরতা ও নস্টালজিক আবহকে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় তাকেও সুন্দর ভাবে তাঁর নাটকে ('মঞ্জরী আমের মঞ্জরী') তুলে এনেছেন তিনি।

বেরটোল্ট ব্রেখটের 'দ্য থ্রি পেনী অপেরা' অবলম্বনে তাঁর 'তিন পয়সার পালা' যখন মঞ্চে উপস্থাপিত হলো তখন এর আঙ্গিকসহ, মঞ্চায়ন ও নাট্যপ্রয়োগ রীতির নানা ক্ষেত্রেই অভিনবত্ব আনলেন অজিতেশ। তদুপরি এই নাটকের অভিনয় দেখে দর্শক সাধারণের কখনও মনে হয়নি যে তারা দর্শকাসনে বসে কোনো বিদেশী নাটকের মঞ্চায়ন দেখছেন। তাঁর সমকালে এই রীতির অভিনবত্ব জনপ্রিয়তার প্রায় স্বর্ণশিখর স্পর্শ করেছিল। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার ব্রাত্য বসুর মত হলোঃ "বিদেশী নাটকের স্থানীকরণের বিষয়টা ঐ সময়ের দাবী ছিল। দরকারও ছিল। সে দাবীটা অজিতেশবাবু চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু এই বিশ্বায়ন পরবর্তী যুগে আমাদের থিয়েটারকে আর বিদেশী নাটকের মুখাপেক্ষী হতে হয়না। আমরা আমাদের থিয়েটারের টেক্সট নিজেরাই তৈরী করি। দেশীয় জল-হাওয়া থেকেই উঠে আসে আমাদের চরিত্র ও সংলাপ।" তবে তাঁর মতে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নাটকগুলি বাংলা নাটকের সম্পদ। যতদিন বাঙালি থিয়েটার নিয়ে ভাববে ততদিন অজিতেশ তাঁর স্বকীয়তা নিয়েই তাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন। বলাবাহুল্য নাটকের কোনো চরিত্র অভিনয়ের সময় অনায়াসে তার অন্তরমহলে প্রবেশ করে যেতেন তিনি। এভাবেই তাঁর অভিনয়রীতির প্রকাশকে আমরা দেখতে পাই 'মুদ্রারাক্ষস' কিংবা 'আন্তিগোনে' নাটকে। বাগভঙ্গী তো বটেই, হাঁটাচলা, তাকানো এমনকী শব্দের ব্যবহারেও ইউরোপীয় তথা বিদেশী নাট্যরীতির সঙ্গে তাঁর নিজস্ব অভিনয়ধারার বৈশিষ্ট্যগুলি একেবারে মিলেমিশে গিয়েছিল। মঞ্চের উপর চিরকাল দাপটের সাথেই নিজের অভিনয় প্রদর্শন করে গেছেন তিনি। বেরটোল্ট ব্রেখটের 'দ্য থ্রি পেনী অপেরা'-র সংলাপও রচনা করেছিলেন স্বয়ং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সংলাপের একটু নমুনাঃ "তার আগে তোরা কজন জামা-ফামা গায়ে দে মাইরি। তোর তো জন্ম ইস্তক দেখে আসছি, এই এক লাল শালু গায়ে দিচ্ছিস। তোর গায়ের গন্ধে কাবলি কাঁদবে শালা। সিপাহী বিদ্দোহের পর এটা আর কাচিসনি নাকি বে! দ্যাখ কি-

নি কোমরে গামছা বেঁধে ডাঁরিয়ে আচে। তুই বরযাত্তীর না শ্মশান যাত্তীর রে? ডাঁইরেডাঁইরে হাসচে, যেন বাপ মরেচে।" মহীনের মুখে এ সংলাপে রয়েছে ষোলো আনা খাঁটি বাঙালিয়ানা। তদুপরি যে আঞ্চলিক ভাষাবৈশিষ্ট্য রয়েছে এ সংলাপে তাতে

তাঁকে সাধুবাদ না দিয়ে পারা যায় না। আঞ্চলিক ভাষার অনায়াস ব্যবহারে অজিতেশ অনন্য। তাঁর সাথে যোগ্য অভিনয়সাথী রুদ্রপ্রসাদ (সেনগুপ্ত)ও কেয়া (চক্রবর্তী)।এ প্রসঙ্গে জগন্নাথ বসুর একটি উদ্ধৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কোনো এক সময় সংলাপ সহ তাঁর অভিনয়ধারার বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করে বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী ও দূরদর্শনের প্রাক্তন কর্তা জগন্নাথ বসু বলেনঃ "প্রথাগত অভিনয়ের বাইরে চরিত্র নিয়ে ভেবে সংলাপ রচনা করতেন অজিতেশবাবু। আঞ্চলিক ভাষার অভিনয়ে ওঁর কাছাকাছি কেউ ছিলেন না।" তাঁর সময়কার ও তাঁর সহ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বিভাস চক্রবর্তী, কেয়া চক্রবর্তী, মায়া ঘোষ, পবিত্র সরকার, সন্ধ্যা দে প্রমুখ অন্যতম। তাঁদের মতে অভিনয়টা তিনি সময় দিয়েই করতেন। সৃষ্টি করতেন নানা নাটকীয় মুহূর্ত। সেইসঙ্গে অজিতেশ নিজে মনে করতেন অভিনয়কলা এমন এক নির্মাণশিল্প যা হাতে ধরে শেখানো যায়না, নিজেদের চেষ্টা ও উদ্যম দিয়েই তা তৈরী করতে হয়, নাট্যশিক্ষক তাতে সাহায্য করেন মাত্র। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার বিভাস চক্রবর্তীর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেনঃ "সংগঠক হিসাবে অজিতেশ ছিলেন দোর্দণ্ড অথচ হৃদয়বান।...তবু নাট্যশিক্ষক হিসাবে তাঁর জুড়ি নেই। আমার সৌভাগ্য তাঁর কাছে কাজ শিখতে পেরেছি। পরবর্তী জীবনে আমি নাটক নির্বাচন, তার ব্যাখ্যা বা প্রকাশভঙ্গীতে তাঁকে অনুসরণ করিনি কখনোই কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যে Craft শিখেছি তার সাহায্যেই নির্মাণ করতে পেরেছি আমার নাটক।"(জনৈক বাঙালের সলতে পাকানো, বিভাস চক্রবর্তী, প্রবন্ধ সংকলন, সম্পাদনা সত্য ভাদুড়ী, নয়া উদ্যোগ, ২০০১ সংস্করণ, পৃঃ৯৭)

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যে সময় বেটোল্ট ব্রেখটের 'দ্য থ্রি পেনি অপেরা' থেকে তাঁর 'তিন পয়সার পালা' তৈরী করেছিলেন তার থেকে এখনকার পৃথিবী বহিরঙ্গে অনেকটাই বদলেছে। আবার ভেতর দিক থেকে ততটা বদলায়নিও বটে। কারণ, মানুষের কতকগুলো মূলগত প্রবৃত্তি যথা- লোভ, ঈর্ষা, প্রতিশোধস্পৃহা –এগুলি কোনোদিনই বদলাবার নয়। ব্রেখট এর 'এপিক থিয়েটারে'র ভাবনায় এগুলো মহাকাব্যিক উপাদানের মতো ঘুরে ফিরে আসে এবং অবশ্যই তা রাজনীতিকে সঙ্গী করে। রূপান্তরের সময় অজিতেশ এই ব্রেখটীয় পদচিহ্নগুলিকে অনুসরণ করেছিলেন বলেই আজও তার প্রাসঙ্গিকতা রয়ে যায়। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্রেখটীয় অনুবাদ একসময় খুশী করেনি উৎপল দত্তকে। যদিও পারফরমেন্সের দিক থেকে দানীবাবু, শিশির ভাদুড়ী থেকে শুরু করে অজিতেশ, রুদ্রপ্রসাদ অথবা উৎপল দত্ত সকলেই এতটাই উচ্চমানের ছিলেন যে তার পারস্পরিক অথবা তুল্যমূল্য বিচার করা ধৃষ্টতা মাত্র। 'এপিক থিয়েটার'-এর যে লিরিক অংশ তাকেও এ নাটকের সংলাপে ভারী চমৎকারভাবে ঢালাই করেছেন তিনি। তবে শুধু এপিক থিয়েটারের লক্ষণগুলিকে মান্য করাই নয়, এতে মান্যতা দেওয়া হয়েছে ব্রেখটীয় অভিনয় রীতিকেও। তুমুল সংঘর্ষপ্রবণ নাটকেও যে এতখানি কাব্যিকতা আনা যায়, তা এ নাটক না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তুমুল ক্রুরতা আর কাব্যের পেলবতার মধ্যেও ভারসাম্য বজায় রেখে যাওয়াটাই এ নাটকের ক্ষেত্রে এক সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই নাটকের প্লটে তিনটি মেরু আছে। দুর্ধর্ষ ডাকাত মহীন্দ্রনাথ (এই চরিত্রটাতেই মঞ্চে আসতেন স্বয়ং অজিতেশ), ভাড়াটে ভিখারিদের নিয়ে আশ্রম চালানো যতীন পাল ও তার মেয়ে মহীনের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালানো পারুলবালা, ঘুষখোর পুলিশকর্তা বটকৃষ্ণ আর তার মেয়ে আর মহীনের বিয়ে করে বাপের বাড়ি রেখে আসা বউ প্রীতিলতা। মহীনের জীবনে আছে আর এক পরিত্যক্তা নারী জ্যোৎস্না। মহীনের জীবন যেন দাবার ছক। তেমনই তার এগোনো পিছনো। এই তিন নারীকে ঘুঁটির মতো আগুপিছু করে এগোনোর চালে গড়ায় মহীনের জীবন। মহীনকে নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা চালায় তার শ্বশুর যতীন ও বটকৃষ্ণ। ধরা পড়া গেলেও শেষপর্যন্ত বেঁচে বেরিয়ে আসে মহীন আর সেখানেই থাকে সমকালীন বিচারব্যবস্থার প্রতি ও তথাকথিত সমাজের প্রতি নাট্যকারের প্রবল ধিক্কার।

এক সময় স্বয়ং শম্ভু মিত্রের প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছিল 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'। নাটকটি চেকভের লেখা 'দ্য চেরি অর্চার্ড'-এর নাট্য রূপান্তর। এ নাটকে অজিতেশের অভিনয় ছিল প্রশংসনীয়। শম্ভু মিত্র তখন নিয়মিত নাটক দেখতে আসতেন 'নান্দীকার'-এ। নাটকের একটি সংলাপ অংশে অজিতেশ বাবুর ডায়লগ ছিল মাত করে দেবার মতো। হাসি

আর কান্না দুই মিলিয়ে উরু চাপড়ে অজিতেশের উক্তি: 'এ বাড়ি এখন আমার, এখন আমার, আমি কিনেছি।' সংলাপ বলার ধরনটি এতই অদ্ভুত ছিল যে তাতে মাত হয়ে যেত দর্শকরা। একবার 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' শো-এর শেষে ব্যাকস্টেজে শম্ভু মিত্র অজিতেশের হাতে ইউজিন ও'নিলের নাট্যসংগ্রহ উপহার দেন, যার প্রথম পাতায় অজিতেশকে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছিলেন- 'আগামী যুগের মহানটকে।' ষাটের দশকে অভিনীত 'নান্দীকার'- এর আর এক নাটক 'শের আফগান' মঞ্চস্থ হয় সাফল্যের সাথে। এ নাটকে তরোয়াল হাতে মুখ্য ভূমিকায় অজিতেশের অভিনয় ছিল দেখার মতো। তবে 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' নাটকটিকে যেভাবে বঙ্গীয়করণ করেছিলেন অজিতেশ তাতে তাকে কোনো অর্থেই রূপান্তরিত বলে মনে হয়না। অন্যদিকে হ্যারল্ড পিটারের 'দ্য বার্থ ডে পার্টি' নাটকটির প্রতি তাঁর বরাবরই আগ্রহ ছিল। পরে নাটকটির স্থানীকরণ করে '৩৩-তম জন্মদিন' নামে এক অসাধারণ নাট্য প্রযোজনা মঞ্চস্থ করেন। 'নান্দীকার' ছাড়ার আগে যেমন মঞ্চস্থ হয় 'পাপ-পূণ্য' ('আদুরী' চরিত্রে অভিনয় করেন সন্ধ্যা দে), 'খড়ির লিখন' ('রাণী' চরিত্রে কেয়া চক্রবর্তী ও 'গ্রুসা'-র ভূমিকায় সন্ধ্যা দে), তেমনি 'নান্দীকার' ছাড়ার পর মঞ্চস্থ হয় 'চাক ভাঙ্গা মধু' অথবা 'সোয়াইক গেল যুদ্ধে'-র মতো নাটক। ব্রেখটের নাটক 'The good person of Szechuan' অবলম্বনে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যে নাটকটির মঞ্চায়ন করেন তার নাম দেন 'ভালোমানুষ'। ১৯৭৪ সালে 'নান্দীকার' মঞ্চস্থ করে নাটকটি। বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত সফল এই নাটকটি প্রায় ৩০৫বার অভিনীত হয়। এই নাটকের মূল চরিত্র শান্তা এবং শান্তাপ্রসাদের দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করতেন বিখ্যাত অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তী। ১৯৬১ সালে ইতালিয়ান নাট্যকার পিরানদেল্লোর Six Character in Search of an Author অবলম্বনে IPTA-এর ব্যানারে অজিতেশ মঞ্চস্থ করেন 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র'এবং ওয়েস্কারের ট্রীলজী 'চিকেন স্যুপ উইথ বার্লি' অনুসরণে অজিতেশের রূপান্তরিত প্রযোজনাটির নাম ছিল 'পাঁউরুটি আর মাছের ঝোল'। এটিও ছিল একসময়কার মঞ্চ সফল নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম। পিরানদেল্লোর 'Henry IV' অবলম্বনে তাঁর অন্যতম নাট্য নির্মাণটির নাম হলো 'শের আফগান।'

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত 'পাপপূণ্য' নাটকটি লিও তলস্তয়ের লেখা 'The Power Of Darkness' নাটকের রূপান্তরিত মঞ্চায়ন। ১৮৮৬ সালে 'The Power Of Darkness' লেখেন লিও তলস্তয়। ১৮৮০ সালে রাশিয়ার তুলা প্রদেশে একটি হত্যাকান্ড ঘটে। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত ও সাজা্প্রাপ্তদের সাথে স্বয়ং কথা বলেন লিও তলস্তয়। আর তারই ভিত্তিতে এই নাটকটি লেখেন তিনি। নাটকের গল্পে বৃদ্ধ কৃষক পিটারের তরুণী ভার্যা হয়ে দিন কাটাতে অতিষ্ঠ আনিশিয়া। সে তরুণ কৃষক নিকিতার সাথে প্রেম সম্পর্ক পাতায়। নিকিতার মা মাত্রিওনা আবার এই সম্পর্কে হাওয়া দিয়ে যান, যাতে তার ছেলে কব্জা করতে পারে আনিশিয়ার সম্পত্তি। একসময় মাত্রিওনার বুদ্ধিতেই বিষপ্রয়োগ করে স্বামীকে খুন করে আনিশিয়া। ব্যাপারটা অবশ্য বুঝতে অসুবিধা হয়না পিটারের আগের পক্ষের কণ্যা আকুলিনার। এদিকে পিটারের সম্পত্তি হাতিয়ে পুরোপুরি বদলে যায় নিকিতা। সে হয়ে ওঠে বাড়ীর সর্বময় কর্তা। আনিশিয়া তার দাসী। মদ্যপান ও ইতর শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহারে এ এক অন্য নিকিতা। পিতাকেও সে অপমান করতে কসুর করেনা। পিটারের আগের পক্ষের মেয়ে আকুলিনার সঙ্গে সে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, ফলে আকুলিনা গর্ভবতী হয়। যদিও সে অবিবাহিতা ও সম্পর্কে সৎ মেয়ে তবু তার গর্ভে এসেছে নিকিতার সন্তান। সন্তানটিকে প্রসব করে বটে আকুলিনা কিন্তু চায় তাকে মেরে ফেলতে। প্রবল অনিচ্ছা আর দোটানা নিয়ে কবর খুঁড়তে শুরু করে নিকিতা। তারপর সদ্যজাত শিশুটিকে শুইয়ে দেয় সদ্য খোঁড়া কবরের মাটিতে। শিশুটির বুকের ওপর চড়ায় পিঁড়ি আর তার ওপর উঠে দাঁড়ায় বলিষ্ঠ নিকিতা। মরণার্তনাদ করে ওঠে শিশুটি। প্রবল পায়ের চাপে তার বুকের হাড় গুঁড়িয়ে যায়। একসময় শিশুটির পাঁজর ভাঙার শব্দ শোনা যায়। এখানেই শেষ হয় নাটকটি। নানা নিষেধাজ্ঞার কারণে এ নাটক অবশ্য একসময় রাশিয়ায় মঞ্চায়িত হয়নি। প্রথমবার এ নাটক মঞ্চস্থ হয় ১৯০২ সালে। 'নান্দীকার' ছাড়ার পর নতুন নাট্যদল 'নান্দীমুখ' গড়েন অজিতেশ। আর সে বছরই 'The Power Of Darkness' অবলম্বনে তাঁর 'পাপপূণ্য' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এ নাটকের আঙ্গিক ও চরিত্রায়ণে দেশীয় মেজাজ থাকলেও এর আত্মায় আছে তলস্তয়ের নিজস্ব ভাষ্য। ষোলআনা খাঁটি বাঙালিয়ানার রসে আর্দ্র হলেও এ নাটকের রুশ মেজাজ সহ সমস্ত নাটকীয় মুহূর্ত গুলিকেই অক্ষুণ্ণ রেখেছেন তিনি। নিতাই গড়াই নামক মুখ্য চরিত্রে অজিতেশের অভিনয়ও ছিল অভূতপূর্ব। অজিতেশের প্রযোজিত মৌলিক এবং রূপান্তরিত নাটকগুলির বিশ্লেষণ করে নাট্যকার পবিত্র সরকার বলেনঃ " 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' বা 'চার অধ্যায়' ধরণের প্রথাগত ফর্মের নাটক, পিরানদেল্লোর নাটকের মধ্যে নাটক কিংবা মায়া ও বাস্তবের বিভ্রম সৃষ্টির নানা কলাকৌশল, চেকভের বেদনা ও কৌতুকের প্রগাঢ় মিশ্রণ ও কিছুটা বাস্তববাদী মঞ্চ, সংস্কৃত নাটকের প্রায় খোলা মঞ্চ প্রকরণ, ব্রেখটের নিজস্ব ধরণ ধারণ ও ভারতীয় সংস্করণে পরিবেশিত বিষঙ্গীকরণ বা এলিয়েনেশনের আকৃতি, 'দাও ফিরে সে অরণ্য'-এর পথনাটিকা রূপ, 'কাব্যনাট্য', 'নীলিমাতে' বা '৩৩তম

জন্মদিবসে' অ্যাবসার্ড নাট্যরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আবার যাত্রায় গিয়ে যাত্রার নির্দেশনাতে নতুন ভাবনা চিন্তার আরোপ এত ব্যাপ্তি এই অল্প কয়েক বছরের (২৫ বছরের মতো) আর কোনো নাট্য ব্যক্তিত্বের ছিল কিনা সন্দেহ।" (নাট্যমঞ্চ ও নাট্যরূপ, পবিত্র সরকার, অখন্ড সংস্করণ, দে'জ, ২০০৮, পৃঃ৫৯০) বস্তুতই নাট্যব্যক্তিত্ব অজিতেশের নাটকে বিশ্বায়ন ভাবনার অবকাশ তাঁর বহুমুখী কর্মকান্ডের অঙ্গ হিসাবে যে কতখানি সম্প্রসারিত হয়েছিল তা তাঁর এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়। অন্যত্র সমালোচক রাজদীপ কোনার বলেনঃ "Theatre according to him was a European medium and thus Ajitesh wanted to understand it through practice. He had a thought that through these exercises he would be able to give shape to an Indian form of theatre. One has to realize, that when he began with adaptations or translations of foreign plays, he was not interested in their philosophy but their form. Ajitesh himself clarifies-'When Nandikar performed foreign plays it was this exercise with form which the principal objective. It was same reason to do Pirandello. We were not much concerned about the philosophical nitty-gritties of Pirandello rather we were enticed by the form of Pirandello's plays.' ফর্মের পাশাপাশি প্রাচ্য তথা বাংলা ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অজিতেশ তাঁর রূপান্তরিত নাটকগুলিতে যে এক সমান্তরাল স্থান দিয়েছিলেন একথা বলাই বাহুল্য।

সত্য যে, তাঁর থিয়েটার জীবনের প্রথম পর্বে থিয়েটারের প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির সঙ্গে লড়াই করে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছিল। একদিকে উৎপল দত্তের বামপন্থী প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির উৎরোল ও অন্যদিকে শম্ভু মিত্রের ব্যক্তিত্বের নৈতিকতা ও জাতীয়তাবাদ পুষ্ট রবীন্দ্রাদর্শের মাঝে অজিতেশের বিনম্র আগমণ। প্রথম জীবনে অর্থাৎ '৪০ এর দশকে বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা অজিতেশকে বিপন্ন করেছে। বছর কেটে গেছে এক ভয়ংকর ভাবনা ও দুরন্ত মানসিক ভীতি নিয়ে। এই মানসিক ভীতি কাটাতেই হয়তো একসময় ফুটবল, রাজনীতি আর থিয়েটারে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন তিনি। কিন্তু মজার বিষয় প্রথমে তিনি ছাড়েন ফুটবল, পরে রাজনীতি ছাড়ে তাঁকে আর এভাবেই থিয়েটারের সাথে শেষাবধি যুক্ত হয়ে পড়েন তিনি। বলাবাহুল্য এ থিয়েটার সর্ব রাজনীতির কলুষমুক্ত একান্ত নিজস্ব ভাবনার থিয়েটার। যদিও সেঅর্থে Political Hegemony কোনোদিনই অজিতেশের ব্যক্তিসত্তাকে সেভাবে প্রভাবিত বা আলোড়িত করতে পারেনি এমনকি IPTA থেকে বেরিয়ে আসার পরও অজিতেশ সরকার অথবা কোনো রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থেকে বা তাদের আর্থিক প্রোৎসাহনে নাটক করারও তীব্র বিরোধী ছিলেন। যে কারণে পরবর্তীতেও কখনই তাঁর নাটকে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল অথবা মতের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটেনি। আসলে অজিতেশ রাজনীতি, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ এবং শিল্পের মধ্যে এক গভীর সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম ছিলেন। এ প্রসঙ্গে রাজদীপ কোনার তাঁর সমালোচনায় যথার্থই বলেনঃ "In an era where categories like political and ethical; globalism, nationalism and regionalism are contested with such intensity and zeal, I believe it would be crucial to re-read Ajitesh who successfully negotiated them to leave behind an experiment in theatre practice where perhaps the secrets to the future of our theatre and our life lies." বস্তুত অজিতেশের নাট্যসত্তায় রাজনীতি আগাগোড়াই একটা নৈতিক চিন্তন-সূত্র রূপে কাজ করেছে। রাজনীতি তাঁর কাছে অবশ্যই ব্যক্তিসত্তার গভীরে লুকিয়ে থাকা এমন কোনো ব্যক্তি-নৈতিকতা যা কোনোপ্রকার সমঝোতার মধ্যে না গিয়েও কেবলমাত্র যৌথ দায়িত্বকর্মের মধ্যে দিয়ে তার শ্রেষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। তাঁর কাছে রাজনীতি মানে কোনো একটি নির্দিষ্ট দল অথবা সংগঠনের সর্বৈব নিয়ন্ত্রণ নয়, রাজনীতি ও তার উদ্দেশ্য যদি বাস্তবিক অর্থেই সৎ ও জনকল্যাণমুখী হয় তবে তা হয়ে ওঠে ব্যক্তি ও সমষ্টি তথা জনগণের মধ্যকার এমন এক অবিরাম সংযোজন যা নির্বাচিত ভাষা বা সংলাপের বহিঃপ্রকাশেও বিস্তৃত হতে পারে। গণমাধ্যম হিসাবে নাটক আমাদের সেই ভাষা ও সংলাপেরই বহিঃপ্রকাশের সুযোগ দেয় ও তার দ্বারাই রাজনীতি আরো বেশী করে তার সদ্ উদ্দেশ্য স্থাপনে জনগণের আরো কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে।অভিজ্ঞ নাট্য সমালোচক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অজিতেশঃ থিয়েটার-রাজনীতি' নিবন্ধ অনুসরণে রাজনীতি, শিল্প এবং ব্যক্তিগত মূল্যবোধ সম্পর্কে অজিতেশের দৃষ্টিভঙ্গীটি কেমন ছিল সে বিষয়ে আরো আলোকপাত করা যেতে পারে। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে বর্তমানকালে যাকে রাজনৈতিক নাটক বলা হয় অজিতেশ তার সাথে সরাসরি সেঅর্থে কখনোই যুক্ত ছিলেন না। অজিতেশের প্রথম নাট্যদল 'নান্দীকার' বহুলাংশে রাজনৈতিক মতাদর্শে চালিত হলেও অজিতেশের পক্ষে তা গ্রহণের সঙ্গত কোনো কারণ ছিলনা। কারণ মঞ্চক্ষেত্রে সরাসরি বাস্তব রাজনৈতিক বাতাবরণের কোনোরূপ প্রদর্শন অথবা চাপিয়ে দেওয়া কোনোরূপ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে নাটকে তুলে ধরা নয় বরং নাটক তার যথার্থ রাজনৈতিক দায়িত্ববোধে চালিত হচ্ছে কিনা সেটা অনুধাবন করাই নাট্যপ্রযোজকের আশু কর্তব্য। সদর্থক অর্থে যদি কোনো নাট্যকারকে রাজনৈতিক নাটক করতেই হয় অথবা যদি থিয়েটারকেই সদর্থক অর্থে তার রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতে হয় তবে তা শুধুমাত্রই ঐ সমমনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক দলের মানুষের (এখানে দর্শক) সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনা অথবা শেষ হয়ে যায়না। প্রকারান্তরে, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছতে হলে রাজনৈতিক নাটককে অবশ্যই তার সঠিক রাজনৈতিক দায়িত্ববোধের দ্বারাই চালিত হতে হবে।পরিশেষে, অজিতেশের রাজনৈতিক মূল্যবোধ প্রকৃত অর্থেই কেমন ছিল তা জানতে অজিতেশেরই লেখা দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের শরণাপন্ন হতে হয়। 'বৈপ্লবিক থিয়েটার এবং আমাদের আজকের সংগ্রাম' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি যা বলেন তার মর্মার্থ হলো এই যে, কোনো সংরক্ষণ ছাড়াই তিনি বিশ্বাস করেন যে যেকোন শিল্পেরই সর্বদাই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দর্শন দ্বারা চালিত হওয়া উচিৎ, না হলে সংস্কৃতির সৌধে থাকতে থাকতে একসময় যেকোন শিল্পই তার প্রকৃত গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। তাঁর অভিজ্ঞতায় তিনি ঠিক তেমনটিই দেখেছেন। তবু কেন তিনি থিয়েটার করেন? কেমন থিয়েটার তিনি করতে ভালোবাসেন? কেমন করে তিনি থিয়েটার করেন? তাঁর মতে যদি একজন শিল্পী এই প্রশ্নগুলির উত্তর বিষয়ে রাজনৈতিকভাবে স্বচ্ছ না হন তাহলে সমাজ সচেতন একজন নাট্যকার হিসাবেও তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ আত্মসন্তুষ্টির জায়গায় পৌঁছনো অসম্ভব। অন্যদিকে 'অত্যল্প অভিযোগ' প্রবন্ধে তিনি যা বলেন তার সারমর্ম হলো এই যে, কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' অবশ্যই এক অসাধারণ নাটক, কিন্তু তা সমসাময়িক রাজনীতি অথবা সমাজ-রাষ্ট্রব্যবস্থার কোনো রাজনৈতিক প্রতিফলনকে তাঁর নাটকে তুলে ধরেনি। সেকালের দর্শকও কিন্তু এ নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক সমস্যার প্রতিফলন ঘটেছে কিনা তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি। মনঃসমীক্ষণের নাটক, ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব নিয়ে লেখা নাটক, সমাজ প্রসঙ্গে ধর্ম ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক নৈতিক বিচার ও বিশ্লেষণাত্মক নাটক যুগের পর যুগ ব্যাপী থিয়েটারের বিষয় হয়ে উঠেছে এবং তাদের অধিকাংশই উত্তরপুরুষবর্গের কাছে তাদের স্বীকৃতি প্রতিপাদনেও সমর্থ হয়েছে। আসলে দর্শক সাধারণ আজ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে যে নাটকের তথাকথিত রাজনৈতিক প্রবক্তারা আসলে বাণিজ্যিক থিয়েটারের কাছে যতটা দায়বদ্ধ থিয়েটারের আদর্শের কাছে ততটা নয়। এভাবে তাঁরা শুধু রাজনীতিকেই নয় বরং ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক স্বার্থে রাজনীতি এবং নাটক উভয়কেই ক্রমাগত শোষণ করে চলেছেন।

এটি ঘটনা যে বিদেশী নাটকের আত্তীকরণ ও তার অনুবাদকর্মের মধ্য দিয়ে বাংলা নাট্য সাহিত্যের জমি উর্বর হয়েছে ও ঘরের ফসল হিসেবেই তা বাংলা থিয়েটারকে কালে কালে সমৃদ্ধ করেছে। উৎপল দত্ত সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে তাঁর ছাত্রাবস্থা থেকেই একের পর এক শেক্সপীরিয়ান রীতির নাট্যচর্চা করে গেছেন। এ বিষয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ গ্রুপেরই ব্রিটিশ নাট্য পরিচালক Jeffrey Kendhal-এর প্রভাবও কাজ করেছে। পরবর্তীতেও শ্রী দত্তের প্রযোজনায় একাধিক উৎকৃষ্ট বিদেশী অনুবাদ চোখে পড়ে। কিন্তু ১৯৬০ ও '৭০ এর দশকে বাদল সরকারের এবং ইন্দ্রজিৎ, বাকি ইতিহাস এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ, রাজরক্ত, কণ্ঠনালীতে সূর্য, ক্যাপ্টেন হুররা, মহাকালীর বাচ্চা প্রভৃতি নাটকের মধ্যে দিয়ে বাংলা নাটক আরো বেশী বিস্তৃতি লাভ করেছে। বাংলা নাটকের উন্নতিতে উক্ত নাটকগুলির অবদান অনন্য। নাট্যসমালোচকদের মত উক্ত নাটকগুলি রচনা ও অনুপ্রেরণার পেছনে বিদেশী নাটক পড়া ও তার সারার্থ অনুধাবন সমসাময়িক অ্যামেচার থিয়েটার গ্রুপগুলির জনপ্রিয়তা ও মান দুই-ই অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করেছিল। ১৯৬১ সালে ইতালিয়ান নাট্যকার পিরানদেল্লোর Six Character in Search of an Author অবলম্বনে IPTA-এর ব্যানারে অজিতেশ মঞ্চস্থ করেন 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র', কিন্তু IPTA –এর পক্ষ থেকে অবিলম্বে অভিযোগ ওঠে ও IPTA –এর ব্যানারে পিরানদেল্লোর এই নাটকের অভিনয় বন্ধ রাখতে বলা হয়। ফ্যাসিস্ট স্বৈরতন্ত্রী মুসোলিনীর সহিত সংযোগের কারনে পিরানদেল্লোর নাটককে সেসময় বাংলায় বর্জন করা হয়েছিল। নান্দীকারের রাধারমণ তফাদারের স্মৃতিসূত্রে জানা যায় যে, স্বয়ং উৎপল দত্তও সে সময় পিরানদেল্লোর কোনো নাটকে perform করতেন না। রাজনৈতিক মেরুকরণের ফলে IPTA-এর ফ্রেমওয়ার্কে তখন অজিতেশের মতো চিন্তাশীল ও আন্তরিক নাট্যকারদের নাট্যপ্রচেষ্টায় এতটাই আঘাত আসে যে তিনি একসময় IPTA-এর কাজকর্ম সম্পর্কেও ঘোরতর সন্দিহান হয়ে ওঠেন। পিরানদেল্লোর নাটকটির বঙ্গীয়করণ নিয়েও তাঁকে এসময় নানাভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। আরো বেশী সমালোচনা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল ব্রেখটের 'Three Penny Opera' অবলম্বনে 'তিন পয়সার পালা' নাটকটি মঞ্চায়নের সময়। মার্কসীয় প্রসঙ্গকে বাতিল করে বাংলা নাটকে ব্রেখটের প্রতি তিনি ঘোরতর অমর্যাদা ও অবিচার করেছেন - উৎপল দত্ত সহ প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্বের কাছে এমত অভিযোগও তাঁকে শুনতে হয়। কিন্তু আমরা সকলেই জানি অজিতেশের শুরুটা ছিল বিদেশী নাটকের অনুবাদ কর্মের মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের আদান-প্রদানে। সাহিত্যের এ যে এক অতি শুভ উদ্দেশ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নানা সময় বিশিষ্ট জনের কাছে বক্তব্যে ও বিভিন্ন জনসভায় থিয়েটারের ইতিহাস থেকে তিনি নানা ঘটনার উদাহরণ টেনে এনেছেন এবং বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে অনুবাদকর্ম ছাড়া একসময় সমগ্র পৃথিবীর নাট্য ঐতিহ্য কতটাই দীন ছিল। তাঁর কথায় উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের নাট্য প্রযোজনা অথবা অধিকাংশ আধুনিক ইংরেজী নাটক যথার্থ অনুবাদের অভাবে কখনই রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। স্ট্যানিসলাভস্কি (Stanislavski) কখনই 'An Enemy of the People' নাটকের প্রযোজনা করতে সমর্থ হতেন না যদি না তিনি নরওয়েবাসী নাট্যকার হেনরীক্ ইবসেনের রচনার মূলানুবাদ না করতেন। জার্মান ভাষায় অনূদিত না হলে বেরটোল্ট ব্রেখটের পক্ষেও গ্রীক নাটক মঞ্চস্থ করা কখনই সম্ভব হতো না। একই কারণে অতি সম্প্রতি ইতালিয়ান নাট্যকার পিরানদেল্লোর নাটক ইংল্যাণ্ডে মঞ্চস্থ হতে পারেনি। অজিতেশ আরো স্মরণ করিয়ে দেন যে একশো সত্তর বছর আগে একজন বিদেশী অর্থাৎ রাশিয়ান নাট্যকার গেরাসীম স্টেপনোভিচ্ লেবেডফের (১৭৪৯-১৮১৭) হাতেই কলকাতায় বাঙালির প্রথম রঙ্গমঞ্চ 'বেঙ্গলি থিয়েটার'- এর প্রতিষ্ঠা তথা আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং সেখানে অনুবাদিত নাটক ('The Disguise' এবং 'Love is the Best Doctor' নামে দুটি নাটকের অনুবাদ মঞ্চস্থ হয়) মধ্য দিয়েই বাংলা মঞ্চনাটকের সূত্রপাত হয়।

শম্ভুমিত্রের শুদ্ধবাদী থিয়েটার চর্চা এবং উৎপল দত্তের সোচ্চার বামপন্থী নাট্য চর্চার বাইরে থেকে বিদেশী নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তরিত নাটকে অভিনয়ের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে যখন তৃতীয় পাণ্ডব হিসাবে তাঁর আগমন তখন শম্ভু মিত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে গেছে নিউ এম্পায়ারে আর উৎপল দত্তের নাট্য ফলশ্রুতি অজগরের মতো থাবা বিস্তার করেছে মিনার্ভা থিয়েটারে। অজিতেশের থিয়েটার চর্চার মাত্র বৎসরের তেইশ বৎসরের (১৯৬০-১৯৮৩) আয়ুস্কালে এসেছেন মনোজ মিত্র, বাদল সরকার অথবা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মতো নাট্যকাররাও। ষাট এবং সত্তরের দশকে বাদল সরকার প্রবৃত্ত হয়েছেন ও একনিবিষ্ট থেকেছেন অ্যাবসার্ড তথা থার্ড থিয়েটারের প্রতি। মনোজ মিত্র তাঁর সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা পৌরাণিক ভাবনার বিমিশ্রণে লিখেছেন ভিন্ন স্বাদের নাটক। মনোজ মিত্রকে ভীষণভাবেই আচ্ছন্ন করে আছেন ইবসেন অর্থাৎ তাঁর ওপর আছে ইবসেনের প্রচণ্ড প্রভাব। আর মোহিত চট্টোপাধ্যায় থিয়েটারের সঙ্গে নিজের বিচ্যুতি ঘটিয়েও একের পর এক লিখে চলেছেন কিমিতিবাদী নাটক। অন্যদিকে নাট্য সংস্কৃতির অন্যতম পুরোধা অজিতেশ ষাটের দশক পর্যন্ত বাংলার সমাজের বুকে বসেই দেখেছেন নানা নাটকীয় পরিবর্তন। ফ্যাসীবাদী বর্বরতা, বাঙালীর মূল্যবোধের রূপান্তর, দারিদ্র ও হতাশা, যুবমানসের ভাঙন, দেশীয় নানান আর্থিক সংকট ও বিশ্ব রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত তাঁকে আলোড়িত করেছিল। এছাড়াও ১৯৬২-এর চীন-ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৩-এর কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধাবিভক্তি, ১৯৬৪ সালে কলকাতায় ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ, ১৯৬৫-এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, ১৯৬৬-এর খাদ্য আন্দোলন অন্য অনেক খ্যাতিমান নাট্যকারের ন্যায় তাঁর নাট্যকার সত্তাতেও আঘাত হেনেছিল। ১৯৬৭তে ঘটে নকশাল আন্দোলন। এ সময় চীন-ভারত সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় বার কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে যায়। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে ১৯৭৬-এর জরুরী অবস্থা পর্যন্ত নানাসময়ই চরম সামাজিক বিশৃংখলা সৃজনধর্মী নাট্যনির্মাণের পথে অন্যতম অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। গণহত্যা, মিসা, থার্ড ডিগ্রী, নগ্ন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ছিল ষাট-সত্তরের দশকের নিত্যকার ঘটনা। এই সময়ই যৌবনকে সার্থকতার ও সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরার অঙ্গীকার নিয়ে উঠে এসেছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত অথবা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মতো খ্যাতিমান নাট্যকাররাও যা ব্যাপকার্থে পারেন নি। প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়েই তাঁর নাটকে উঠে এসেছেন বাংলার অনেক তরুণ নাট্য সম্পদ। পেশাদার ও অপেশাদার থিয়েটারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে অত্যন্ত সিরিয়াস নিজেও একটা সময় থিয়েটারের পাশাপাশি যাত্রা, বেতার, চলচ্চিত্র সকল ক্ষেত্রেই নিজেকে সমভাবে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন আর তা সম্ভব হয়েছিল তাঁর অপেশাদারীত্বের স্বভাব বৈশিষ্টেই। উৎপল দত্ত চলচ্চিত্রে অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করলেও পরিচালনা ব্যাতীত সরাসরি যাত্রাভিনয়ে আসেন নি। তদুপরি নাট্য নির্বাচন ও পরিচালনায় অজিতেশ প্রায়শঃই ফলিত নাট্য প্রয়োগ রীতির উপর জোর দিয়েছেন। যার ফলে আপাদমস্তক থিয়েটারী প্রয়োগের মুন্সীয়ানা চোখে পড়েছে তাঁর অভিনয় ও পরিচালনায়। সেদিক থেকে তাঁর রূপান্তরিত নাটকগুলিও পিছিয়ে ছিল না। অনেকের ধারণায় তথাকথিত ইন্টেকলেকচ্যুয়াল নাট্য প্রয়োগ রীতির দিক দিয়ে অজিতেশ শম্ভু মিত্র থেকেও হয়তো বা কিছুটা পিছিয়ে ছিলেন। তবে 'বাংলা নাট্যমঞ্চ সমিতি' প্রতিষ্ঠার সিংহভাগ কৃতিত্ব শম্ভু মিত্রকে দেওয়া হলেও এর নেপথ্য কাণ্ডারী ছিলেন অজিতেশ। 'বাংলা নাট্যমঞ্চ সমিতি'র উদ্যোগে 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকটি অভিনয়ের নির্দেশনাও তাঁরই দেওয়া। এ নাটকে নির্দেশনার পাশাপাশি অভিনয়ও করেন অজিতেশ। শুধু বিদেশী নাটকের রূপান্তরিত অবয়বে নয় বরং ভারতীয় ধ্রুপদী তথা সংস্কৃত নাটকের প্রতি যে

অজিতেশ কতখানি অনুরাগী ছিলেন, সাবলীল ছিলেন তার অভিনয়ে 'মুদ্রারাক্ষস'-এ তাঁর অভিনয়ই তার প্রমাণ। তিনি মনে করতেন সংস্কৃত নাটকের যথাযথ অনুবাদ কর্মের মধ্য দিয়েও বাঙালির নাট্যচর্চা এগোতে পারে। যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতি তথা সংস্কৃত নাট্যচর্চা ক্রমেই গোটা বিদেশে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠছে সেখানে ভারতীয় হিসাবে আমাদের তথাকথিত নীরবতা তাঁকে ব্যথিত করেছিল। তাঁর আরও ধারনা ছিল মঞ্চসফল সংস্কৃত নাটকের বঙ্গীয়করণ বিনা ভারতীয় নাটক বিশ্বের দরবারে তার স্বপ্নপূরণের আশার উন্নতি ঘটাতে পারবে না। তৎসহ অন্যান্য বিদেশী নাটকের অনুবাদ অথবা আত্তীকরণ ছাড়া শুধুমাত্র গুটি কয়েক সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের মধ্য দিয়েও ভারতীয় নাটকের বিশ্বায়নের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবেনা। তবে শুধুমাত্র সংস্কৃত নয়, তাঁর মতে আমাদের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যের উপরও জোর দেওয়া উচিত। নাট্যকর্মের পরিধিতে সেগুলিরও অনুবাদ কাম্য। বাংলা ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও থিয়েটারের শক্তিশালী ক্ষেত্র রয়েছে। থিয়েটার সেখানে অনেকাংশেই জোরালো গণমাধ্যম। আমরা যখন বিখ্যাত নাট্যপরিচালক ইব্রাহিম আলকাজির কথা শুনি তখন স্বভাবতই তাঁর নাট্যকর্মের গুরুত্বের প্রতি অনুসন্ধিৎসু হই। একসময় শম্ভু মিত্র তাঁর নির্দেশনা ও অভিনয়ের গুণে দর্শক মনে আলোড়ন তুলেছিলেন যা ছিল শুধুই শম্ভু মিত্রের একক অবদান। 'রাজা অয়দিপাউসে' তাঁর অভিনয় একসময় দর্শকহৃদয়ে যে টানটান উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে, সৃষ্টি করেছে যে গ্রীক আবহ তা ছিল অভিনব। অয়দিপাউসের অতি হাহাকার, 'রাজা' নাটকে অন্ধকারের মধ্যে নিঃসঙ্গ রাজার একক কণ্ঠস্বর, স্বরের ওঠানামা, কখনো মৃদু, সূক্ষ্ম অথচ তীব্র শব্দক্ষেপণ তুলনারহিত। সত্যিই সেখানে রাজা অথবা নামভূমিকায় স্বয়ং নাট্যকার একা অথবা নিঃসঙ্গ। এমন প্রকাশভঙ্গীই বাংলা নাট্যাভিনয়ের জগতে শম্ভু মিত্রকে স্বতন্ত্র করেছে। শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটক প্রসঙ্গেও এমন কথা বলা যেতে পারে। সত্তর থেকে আশীর দশক পর্যন্ত অজিতেশ ও উৎপল দত্তের অভিনয় ধারার যে সমৃদ্ধি তাও অনেকক্ষেত্রে তাঁদের নাট্যাভিনয়েও একই মান্যতা ও উচ্চতা লাভ করেছে যা মঞ্চ ইতিহাসের আর এক স্বতন্ত্র অধ্যায় রূপেই স্বীকৃত। অন্যদিকে নাট্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে অজিতেশ কখনও দেশ-কালের কোনো সীমায় আবদ্ধ থাকেন নি। জার্মান, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের নাটককে তিনি করে তুলেছেন বাংলা নাট্যমঞ্চের সম্পদ। শুধু বাংলা ভাষায় রূপান্তরই নয়, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিকে বাংলার শুদ্ধ সংস্কৃতির জারকরসে সিক্ত করেছেন তিনি। আঞ্চলিকতার মাপকাঠি বিচারেও তো তা শ্রেষ্ঠত্বের সীমা অতিক্রম করে গেছে। ভারতীয় তথা বাংলার গণনাট্য সংঘের সাথে যোগসূত্রের কারণেই তাঁর থিয়েটারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হলো সমকাল ও নাট্যবিষয়ের সাথে সমাজ ও রাজনীতির প্রগাঢ় সংযোগ। নাট্যরীতি দেশী বা বিদেশী যেমনই হোক না কেন সমকালীন বাঙালি সমাজের বাস্তব দৃশ্যায়নে তিনি কোথাও কোনো কমপ্রোমাইজ করেন নি। সমস্ত নিন্দা অথবা প্রশংসার উর্ধে থেকে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতাকে একেবারে আড়াল না করেই একজন সচেতন ও সংবেদনশীল নাট্যকর্মী হিসেবে বিশ্বনাট্যসাহিত্যের ঐতিহ্যকে এক স্বাভাবিক উত্তরাধিকারের অর্থে গ্রহণ করেছেন তিনি। ব্যক্তি সহ দেশ ও সমাজকে বাংলার আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাস্তবতার সাথে তুলে ধরার অনন্য প্রয়াস ছিল তাঁর। বিশ্লেষণমুখী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর থিয়েটার ও অভিনয়ের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

বিদেশী নাটকের ভারতীয় অনুবাদ বা তার ভারতীয়করণ ও মঞ্চায়ন কি মূল ভারতীয় নাটকের ক্ষতিসাধন করেছে? এর উত্তরে অজিতেশ একসময় বলেন যেকোন ভারতীয় অথবা বাঙালি নাট্য প্রযোজকদের প্রতি এই অভিযোগ অসঙ্গত কারণ যদি তাঁরা সফোক্লিস, চেকভ অথবা আর্থার মিলারের প্রযোজনাকে সফলভাবে মঞ্চায়িত করতে পারেন তবে একই দক্ষতার সাথে তার মূলানুবাদকে ভারতীয় সংস্কৃতির আধারে পরিবেশন না করতে পারার কোনো কারন নেই। আসলে নাট্যকারের দক্ষতা ও সমসাময়িক পরিবেশকে সমবিন্যস্ত করে ঐ নাটকে ফুটিয়ে তোলাটাই হলো মূল কথা। তিনি মনে করতেন বিদেশী নাটকের আত্তীকরণ ও তার রূপান্তরের অভ্যাস ক্রমশঃ বাঙালিকে তার নিজস্ব তথা উৎকৃষ্ট নাটক রচনার মানে পৌঁছে দেবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বিখ্যাত ব্রিটিশ নাট্যকার কেনেথ টাইনানের কথা বলেন। টাইনান একাদিক্রমে সফোক্লিস, সার্ত্রে, আইনেস্কো এবং পিরানদেল্লোর নাট্যপ্রযোজনার মূল্যায়ণ করেছিলেন। এই মূল্যায়ণের ফলশ্রুতি থেকেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন টাইনান বলতে পেরেছিলেন যে আগামী দু-এক বছরের মধ্যেই এই নাটকগুলির দ্বারা ইংল্যাণ্ডের নাট্যসাহিত্য উপকৃত হবে এবং আমরা ইংল্যাণ্ডের বুকেই উৎকৃষ্ট নাট্য প্রযোজনার সন্ধান পাবো। টাইনানের এই বিশ্বাসের ফলশ্রুতিতেই পরবর্তী বছর 'লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার' মঞ্চস্থ হয় ও ইংল্যাণ্ডে এক নতুন নাট্যযুগের সূচনা হয়। অজিতেশের মতে বিদেশী নাটকের অনুবাদকর্মটি এমনই হওয়া দরকার যাতে তা মানুষের মনে এই প্রতীতীর জন্ম দেয় যে তারা পৃথিবীর বুকে অবস্থানরত একই পরিবারের অধিবাসী, তাদের জীবন একই আনন্দ বেদনার অবিমিশ্র খাতে চির প্রবহমান। অজিতেশের নিজের ক্ষেত্রে নাটকে এমন আদর্শ প্রতিস্থাপনের পাশাপাশি আর যে জিনিসটি কাজ করেছিল তা হলো স্থানিক ও বাচিক সংস্কৃতিকে নাটকে স্থান দেওয়া। Regional Culture যে ব্যাপকভাবেই বাংলা নাটককে প্রভাবিত করতে পারে তা অজিতেশের থিয়েটার না দেখলে বোঝা যায়না।

নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের মতানুসরণে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজানো যায়। এ বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর বিদেশী নাটকের স্থানীকরণের ক্ষেত্রেও সমান ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপঃ

১. অসাধারণ কণ্ঠস্বর। তৎসহ পরিমিত রসবোধ।

২. আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ের উপরে সর্বাধিক গুরুত্ব দান। মঞ্চসজ্জা অপেক্ষা চরিত্র ও কাহিনী বিন্যাসের উপর অধিকতর জোর।

৩. নিজ অভিনয়ের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও শারীরিক উচ্চতা ও শারীরিক আবেদনকে কাজে লাগানো। সংলাপ উচ্চারণের ভঙ্গিমায় অদ্বিতীয় অভিব্যক্তি।

৪. সহজ কৌতুক প্রবণতা ও নাটকে বুদ্ধিদৃপ্ত কৌতুকের প্রয়োগ। হাসার ও হাসাবার অনায়াসলব্ধ ক্ষমতা (কখনো তাঁর অট্ট হাস্য দর্শকদের কাছে প্রায় পিলে চমকানো)।

৫. 'অভিনয় এবং একমাত্র অভিনয়ই অভিনেতার শক্তি কেন্দ্র'-

এই মতকে দৃঢ়ভাবে **প্রতিষ্ঠিত করা। অভিনয়কে মূল উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে আপন শক্তির জায়**

গা গুলিকে এমনভাবে তুলে ধরা যাতে অভিনেতার সকল দুর্বলতা ঢাকা পড়ে যায় ওগোটা অভিনয়টাই বড় হয়ে ওঠে আর তার দ্বারাই অভিনেতা নিজের সকল দক্ষতা আর উৎকর্ষকে প্রদর্শন করতে পারে।

৬. অসাধারণ Story Telling **বা গল্প বলার মুন্সীয়ানা। থিয়েটারে তার অভিনব প্রয়োগ। তৎসহ গল্প নির্বাচনে নতুনত্ব।**

৭. দ্রুত সংলাপ কথনের অনায়াস ভঙ্গিমা। আঞ্চলিক ভাষার অভিনয়ে অনন্যতা। অঞ্চলের মানুষের শারীরিক ও ভাষাগত বহিঃপ্রকাশগুলিকে নাটকে প্রয়োগ।

৮. আশ্চর্য পরিমিত সময়ের ব্যবহার।

৯. আশ্চর্য পরিমিত শব্দের ব্যবহার।

১০. জান্তব ও পরাবাস্তব জীবনীশক্তির প্রয়োগ।

১১. খলচরিত্র অভিনয়ে বিশেষ নৈপূণ্য।

১২. বাংলা থিয়েটারে যৌবনের আনয়ন করা ও বাঙালী যুব সমাজকে সৎ থিয়েটারের অভিমুখী করে তোলা।

বাংলা নাটকে অজিতেশ উত্তরকালে অজিতেশের রূপান্তরধর্মী নাটকের আদর্শকে গ্রহণ করেছেন অনেক নট ও নাট্যকাররা। অশোক মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, রমাপ্রসাদ বণিক অথবা রুদ্রপসাদ সেনগুপ্তের মতো নাট্যকাররা তাঁদের নাটকের বিষয় নির্বাচন, রূপান্তর ও অভিনয়ের রীতিতে অজিতেশের নাট্যশৈলীকে অনেকখানি গ্রহণ করেছেন। রুদ্রপ্রসাদের 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র'- এর অভিনয় অজিতেশের অনুসারী। ওয়েস্কারের ট্রীলজী 'চিকেন স্যুপ উইথ বার্লি' অনুসরণে অজিতেশের রূপান্তরিত প্রযোজনা ছিল 'পাঁউরুটি আর মাছের ঝোল'। ওয়েস্কারের মূল নাটক ও অজিতেশের এই রূপান্তরিত নাটকটিকে সামনে রেখেই আবার অশোক মুখোপাধ্যায় রচনা করেন 'বেলা অবেলার গল্প'। বিভাস চক্রবর্তী অজিতেশের নাটকের উত্তরাধিকারকে পাথেয় করেই লিখেছেন 'রাজরক্ত', 'চাক ভাঙা মধু', 'নরক গুলজার', 'মাধব মালঞ্চি কইন্যা'(যেখানে বিভাস চক্রবর্তী অজিতেশের মতোই লোক ফর্মকে ব্যবহার করেছেন)-র মতো বিখ্যাত সব নাটক। অজিতেশের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ব্রেখটের 'দ্য এক্সস্পেশন অ্যান্ড দ্য রুল' অবলম্বনে রূপান্তর করেন যে নাটকটি তার নাম দেন 'বিধি ও ব্যতিক্রম'। ব্রেখটকে অবলম্বন করে সৌমিত্রবাবু আরো বেশ কিছু মঞ্চসফল নাটকের রূপান্তর করেন।

সমালোচকদের একাংশের মতে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকে গৃহিনীপনার অভাব ছিল। শম্ভুমিত্র ও উৎপল দত্তের মতো নাট্যকারেরা যেভাবে তাঁদের অভিনয়, প্রযোজনা বা বিষয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বারে বারে নিজেদের নাট্যব্যক্তিত্বের বদল ঘটিয়েছেন তিনি তা ঘটাতে পারেন নি। কারো কারো মতে এটাই নাকি অজিতেশবাবুর নাট্যব্যক্তিত্বের ট্রাজেডীর অন্যতম কারণ। আমরা বলবো, এই না-বদল হওয়া অজিতেশকে একদিকে যেমন তীব্র সমালোচনার ভাগীদার করে তেমনি অন্যদিকে তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাট্যবৈশিষ্ট্যেরও সন্ধান দেয়। ষাট ও সত্তরের দশক জুড়ে একই আদর্শে অবিচল থেকেছেন অজিতেশ। যেখানে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, উত্তম কুমার ও ছবি বিশ্বাসের মতো মঞ্চাভিনেতা ও চলচ্চিত্রাভিনেতারা বারংবার নিজেদের অভিনয়ের প্যাটার্ন বদলেছেন সেখানে অজিতেশের অভিনয় ও নাট্যভাবনার এই না-বদল হওয়া এক গুরুত্বপূর্ণ অভীপ্সার জন্ম দেয়। নাট্যাচার্য অথবা নটসূর্য হতে চাওয়ার বাসনা, শিক্ষার অহংকার, অভিনয়ের দম্ভ এগুলির কোনোটিই কোনোকালে অজিতেশের মধ্যে ছিলনা। স্বল্পায়ু এই অভিনেতা চিরকাল এক সাধারণ নাট্যকর্মী হয়েই থাকতে চেয়েছেন, চেয়েছেন তাঁর বোহেমিয়ান জীবন, নিজস্ব নাট্যভাবনা, রাজনৈতিক দর্শন থেকে নাট্যদর্শন সবেতেই স্বীয় মতাদর্শে অবিচল থাকতে। এই দৃঢ়তাই তাঁকে অনেকের কাছে বিরাগভাজন করে তুলেছিল, এনেছিল মত ও পথের নানা সংঘাত। 'নান্দীকার' ভেঙে 'নান্দীমুখ' তৈরীর নেপথ্যেও তা কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল। যদিও নব্য-যুব নাট্যকর্মীদের কাছে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা তাতে এতটুকু কমেনি। তাঁদের মতে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসকে সর্বার্থে সমৃদ্ধ করেছেন। ষাটের দশকে রূপান্তরধর্মী নাট্য প্রযোজনার মধ্য দিয়ে থিয়েটারের কালচারগত হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি যুব সমাজে। নতুন নাট্যদল ও নাট্যকর্মীদের দিশারীর মতো নাট্যপথের সন্ধান দিয়েছেন তিনি। বাংলার যুবকদের থিয়েটার অভিমুখী করে তোলার জন্য তিনি যেভাবে তাঁর ডাক তাঁদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাতে তাঁকে বিশ শতকের বাংলার থিয়েটার আঙ্গিনায় যৌবনের আহ্বায়ক অথবা যৌবন বন্দনার শ্রেষ্ঠ প্রাণপুরুষ বললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। পরাধীন ভারতবর্ষের বুকে ও ব্রিটিশ শাসিত সমাজে যে তরুণ বিদ্রোহী শক্তি গুলি ইতিহাস ছাড়া সমাজ মানসে সরাসরি কখনও সাঙ্গীকৃত হয়নি তাই-ই ক্রমে স্বাধীনতার পর নাট্যক্ষেত্রে নতুনভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে, নতুন বিন্যাসেরও জন্ম দিয়েছে। বিদেশী নাটকের আঙ্গিক ও নবাবয়বে তার পুনর্নির্মান অবশ্যই তাকে এক অতিরিক্ত সামর্থ্য যুগিয়েছে। এ বিষয়ে

একচ্ছত্র কৃতিত্বের অধিকারী অজিতেশ। তবে পেশাদারীত্ব তথা ব্যবসায়িক মঞ্চায়নের বাইরে থেকেও এ সময়কালে যে সম্প্রসারিত নাট্যচর্চার উদ্ভব ঘটেছে বাংলায়, বিশ্বায়নের ফলশ্রুতিই সেখানে শেষ কথা নয়। অন্য অনেকের পাশে থেকে অজিতেশবাবুও যে পরিবর্তনের সঙ্গী ও সাক্ষী ছিলেন তাকেই রূপান্তরিত নানা নাট্যকায়ায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি। শম্ভু মিত্রের ভাষায়ঃ 'শ্রীবাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' পড়ে আমি যেরকম মুগ্ধ হয়েছিলুম, কিম্বা 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'-তে অজিতেশবাবুর অভিনয় দেখে যেরকম নেশাগ্রস্তের মতো হয়েছিলুম, এই রকম অসংখ্য রত্নের টুকরো আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে, আমাকে শিক্ষা দিয়েছে। বহুরূপীতে বছরের পর বছর কত লোকের কলাকুশলতা দেখেছি, নাট্যের জন্য কত লোককে কত মহৎ ত্যাগ করতে দেখেছি এইসব যখন ভাবি তখন নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি।' পরাধীন ও স্বাধীন ভারতবর্ষের নাট্যচর্চার ফল সম্পর্কে তাঁর আরো মতঃ 'আমার অভিজ্ঞতায় আমি বলতে পারি যে, শ্রী কুমার রায়ের বিচিত্র চরিত্রাভিনয়ের যে অসাধারণ ক্ষমতা সেরকম ক্ষমতাসম্পন্ন অভিনেতা তখনকার নাটমঞ্চে এক অদ্ভুতকর্মা যোগেশচন্দ্র ছাড়া আর কেউই ছিলেন না। শ্রী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরাট আবেগ প্রকাশ করবার যে অসামান্য দক্ষতা সেই ক্ষমতা তখনকার দিন হলে তাঁকে রাতারাতি কিংবদন্তীতে পরিণত করত।' অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে এর থেকে বড় স্তুতি বোধহয় আর হয়না। আর নাট্য সমালোচক রাজদীপ কোনারের মতেঃ "Ajitesh I believe, presented the third alternative in modern Bengali theatre, as well as a modern Bengali, Indian and perhaps Universal subjectivity."বাস্তবিক অজিতেশ তার নাটকে সমসাময়িক দর্শক সাধারণের কাছে এক তৃতীয় বিকল্পের আদর্শকে তুলে ধরতে পেরেছিলেন যার আবেদন শুধু আধুনিক ভারতবর্ষ বা বাংলার নয় বরং সারা বিশ্বের ছিল। সেদিক থেকে অজিতেশের নাটকের এই বিশ্বজনীনতাকে অগ্রাহ্য করা যায়না।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১. মঞ্চ থেকে মাটিতেঃ শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়- অনীত রায়, টুন প্রকাশ, কলকাতা, ২০১০

২. নাট্য মঞ্চ, নাট্য রূপ- পবিত্র সরকার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭

৩. গণ নাট্য আন্দোলন-দর্শন চৌধুরী, অনুষ্টুপ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮২

৪. হে সময়, উত্তাল সময়ঃ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্য প্রতিভা, প্রসঙ্গ অভিনয়- অশোক মুখোপাধ্যায়, কলাভৃত, কলকাতা, ২০০৭

৫. অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুবাদ নাটক ও মৌলিক নাটক, প্রসঙ্গঃ থিয়েটার প্রোসেনিয়াম নাট্যপত্র, কলকাতা, নভেম্বর ২০১০

৬. Ajitesh Bandopadhay: In the Neighbourhood of Liminality-Rajdeep Konar, Special Issue on Performance Studies, Rupkatha Journal, Volume-V, Number 2, ISSN 0975-2935

৭. পশ্চিমের নাটকঃ ইবসেন থেকে অলবী, রুদ্রপসাদ সেনগুপ্ত, অপেরা, প্রথম সংস্করণ, মাঘ, ১৪১১

৮. আন্তন চেকভঃ বিষয় নাটক, সম্পাদন সত্য ভাদুড়ী, মৌহারী, প্যাপীরাস, প্রথম সংস্করণ, ১৪১২

৯. অজিতেশ নাট্য সংগ্রহ, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, সম্পাদনা সন্ধ্যা দে

১০. 'নাট্য আন্দোলনের তিরিশ বছর', জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, সুনীল দত্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭

১১. 'জার্নাল সত্তর', রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ২০০০

১২. একালের ইউরোপীয় একাঙ্ক, উদয়ন ঘোষ, সম্পাদনা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও সুনীল দত্ত, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯

১৩. অন্য ধারার থিয়েটারঃ উৎস থেকে উজানে, সন্ধ্যা দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭

১৪. অজিতেশঃ ভিতরে আগুন বাইরে প্রশান্তি, প্রসঙ্গ অজিতেশ, বিভাস চক্রবর্তী, থিয়েটার প্রোসেনিয়াম নাট্যপত্র, কলকাতা, নভেম্বর, ২০১০

তথ্যসূত্র:

১. নাটক সমগ্র (১ম ও ২য় খন্ড), অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

২. বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ, কোরক

৩. প্রসঙ্গ অজিতেশঃ থিয়েটার প্রোসেনিয়াম

৪. মঞ্চই জীবনঃ মায়া ঘোষ

৫. অন্যধারার থিয়েটার, উৎস থেকে উজানে, অজিতেশ নাট্য সমগ্র এবং বাংলা নাট্য কোষঃ সন্ধ্যা দে

৬. নাট্যকারের সন্ধানে একটি চরিত্র রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শিলাদিত্য সেন

৭. আধুনিকতার একটি অসমাপ্ত পাঠ, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলাদেশ প্রেম, ২২শে আগস্ট, ২০১৪

৮. আসানসোল শিল্পভূমি: কবি ও কবিতা, বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক ট্রিনিটি ট্রাস্ট আসানসোলের পক্ষে দেবেশচন্দ্র মজুমদার, ২০০৫

পত্রপত্রিকা:

১. 'অজিতেশের যাত্রাপথ', সম্পাদনা মনোজ রায়, সমতট প্রকাশন ১১৭, বিংশ বর্ষ, প্রসঙ্গ সংখ্যা

২. 'নাট্যচিন্তা': অজিতেশ জীবন পঞ্জী, সিদ্ধার্থ গুপ্ত, সম্পাদনা রথীন চক্রবর্তী, নভেম্বর ১৯৮৩

৩. গায়িকা দলের মেয়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা', সম্পাদনা নৃপেন্দ্র সাহা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮

৪. 'অতীতের তাঁরা', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৪

৫. 'রূপান্তরে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়', অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচয়, এপ্রিল-মে, ১৯৮৭

৬. 'অজিতেশ- বিজেতা ও বিজিত', দেবাশীষ দাশগুপ্ত, দেশ, ১২ই নভেম্বর ১৯৮৩

৭. 'নানা রঙের দিনের অজিতেশ স্মরণ', কৃষ্ণেন্দু সেনগুপ্ত, কালান্তর, ২৯শে নভেম্বর ২০০২

৮. 'অজিতেশ- রণক্ষেত্র থেকে ইতিহাসে', অশোক মুখোপাধ্যায়, প্রতিক্ষণ, ২রা নভেম্বর ১৯৮৩

লেখক পরিচিতি :

ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় উত্তর ২৪ পরগণার নহাটা জে.এন.এম.এস. মহাবিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, ছোটগল্পকার ও পত্র-পত্রিকার লেখক।